আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

প্রণীত

—•:•:•—

প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী

৩০নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট।

মূল্য ১৲ মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়
৩৩।এ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩৩৯।

প্রিণ্টার :—
শ্রীশচীন্দ্ররঞ্জন দাস বি,এ।
সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৪।১ বি. বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

আচার্য্য রামেন্দ্র স্থন্দরের

"জগৎ-কথা"

বাঙ্গলাভাষায় পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে এত উৎকৃষ্ট বই আর নাই। Physics এর ন্যায় দুরূহ বিষয় বাঙ্গলায় এত সহজ ভাবে যে লেখা যাইতে পারে তাহা না পড়িলে কল্পনা করা যায় না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়া যাহারা ইণ্টারমিডিয়েটে—Physics লইতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রচনা-সংগ্রহ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বত্নাকবেব রামনাম উচ্চারণে অধিকাব ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধাব লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীবের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ; নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদেব কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয়, আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক্ স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেন-ঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তীটা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশীর লড়াইএর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুন্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌যত কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারা

প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সহৃদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত অভাব যে, অদ্য যে আমরা তাঁহার স্মৃতির উপাসনার জন্য একত্র হইয়াছি, এই উপাসনা ব্যাপারটাই একটা ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমরা তাঁহার তর্পণোদ্দেশে যে বক্তৃতাময় বারির অঞ্জলি প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রেতপুরুষ যদি অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষসমর্থনে বলিবার কথা কি আছে, সহজে খুঁজিয়া পাই না।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার অনধিকারের কথা আসে বলিয়া প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজীর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে, এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয় ত অসম্ভব। তথাপি এই সাংবৎসরিক উপাসনা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশঃ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা। পূজিতের প্রীতি-উৎপাদন, বোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে, পূজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠানসাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও আমরা স্বার্থের অনুরোধে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি না, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবতাকে সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাঁহার স্বজাতি তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনী-পাঠে

কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে পদে পদে লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভূরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকামধ্যে সঙ্কলিত আছে। যদি কোন বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত-লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়, বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবল পর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে, কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইতে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্য্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভর-শক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর

যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালী-চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজকীয় শাসনে চারিদিকে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যখন হিন্দু রাজা হিন্দুরাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা সমধিক উন্নত ছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন না; অন্ততঃ হিন্দুজাতির পুরাবৃত্তের অভাবে এ কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক যতক্ষণ ইচ্ছা চালান যাইতে পারে। কিন্তু গত কয় শত বৎসরে আমাদের দুর্দ্দশার যে একশেষ ঘটিয়াছিল, এবং বর্ত্তমানকালে আমাদের সামাজিক জীবন সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। এই নবজীবন-সঞ্চারের কয়েকটা বড় বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ, আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া স্বর্গের দেবগণ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আমরা মর্ত্ত্যদেহ ধরিয়াও কোনরূপেই ততটা পারি না। এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মানবজীবনের উৎকট সমস্যাগুলার আলোচনা কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ, আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন এবং তৎসহকারে স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রয়াস।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এতদূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমায়ু একেবারেই পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ধর্ম্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একেবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস

করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে, এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়া দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয়সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতে চাহি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু আশা করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তুলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্ত বিনোদনে ও সন্তাপহরণে নিযুক্ত থাকিবে।* কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

বস্তুতই শতাধিক বর্ষব্যাপী সুশাসনে আমরা নিতান্ত আদুরে ছেলে হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পরিণামও বোধ করি আদুরে ছেলের পরিণামের অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ নহে। পালঙ্কের উপর সুখশয্যাশায়ী শিশুকে যখন আরামের সহিত তুলিযোগে চুমুকে চুমুকে দুগ্ধপান করিতে দেখা যায়, তখন বয়স্ক লোকের মুখ হইতে "আহা মরি শিশুকাল" ইতি কবিতাবাণী সনিশ্বাসে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এই শিশুকেই আবার কিছুদিন মধ্যে সেই বয়স্কের স্থান গ্রহণ করিয়া জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইতে হয়। আমাদের স্নেহময়ী গবর্ণমেন্ট-জননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদের আবদারের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পালঙ্ক ও তুলির দুধ সহজে ছাড়িতে চাহিতেছি না এবং আমাদের স্বচ্ছন্দতার অণুমাত্র ত্রুটি ঘটিলেই, শৈশবসুলভ সানুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বাহির করিয়া জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। বাস্তবিকই আমাদের মত সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

আমাদের মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা হইতেই এই অবস্থার উৎপত্তি

---

* যখন এই প্রবন্ধ প্রথম পঠিত হয়, তখন নবীনচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

হইয়াছে আবার সেই অবস্থা হইতেই মেরুদণ্ডের কোমলতা বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা কথায় কথায় আমাদের চরিত্রসংশোধনের প্রস্তাব করি; এবং এই চরিত্রসংশোধন না হইলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই মর্ম্মে মহতী ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি। চরিত্রসংশোধন না হইলে যে উন্নতি ঘটিবে না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু চরিত্রসংশোধন ব্যাপারটাই কি এত সহজ জিনিষ? যেন ইচ্ছা করিলেই চরিত্রটা আপনা-আপনি শোধিত হইয়া যাইবে। কিঞ্চিলিকা যেন ইচ্ছামাত্রেই আপনাকে কুম্ভীরে পরিণত করিবে। ডারুইন-বাদীরা বলেন, কুম্ভীরেরও পূর্ব্বপুরুষ এককালে কেঁচোর মত ছিল। কিন্তু সেই কুম্ভীরত্বে পরিণতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে কত যুগব্যাপী জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। ইচ্ছামাত্রেই চরিত্রশোধন ঘটে না; এবং প্রস্তাব দ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের সম্মুখীন হইলে আমাদের ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি জন্মিয়া যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এইরূপে সেই আত্মগ্লানির কতকটা ওজর মিলিতে পারে।

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্ত্বনা মিলিতে পারে বটে, কিন্তু এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কাল-বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই, সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে, সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই, সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ,

যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদেরই মধ্যেই পাওয়া যায় ; আমাদের মত যাহার তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে, ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদেব মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীব আলোচনাব বিষয়।

সেই জন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পবিচয় দিতে দ্বিধা হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধগুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দেব আমরা যতই নিন্দা কবি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ, আমাদেব মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চবিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চবিত্রে তাহা প্রচুর পবিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহাব সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরেব জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পাবে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্র-গঠনে অনেকটা আনুকূল্য কবিয়াছিল. সন্দেহ নাই, কিন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে ও মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন কবিয়া তিনি বীরের মত সেই বণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনেব বন্ধুব পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন। অনেক পাশ্চাত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্ব্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল, আর নূতন মশলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরেজি একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরেজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা সহরের অবস্থাটা ঠিক্ এমনি না হইতে পারিত, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই, এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজত্ব

সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোন মহাশয় এইরূপ একটা কথা তুলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যগণের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুম্বিতাস্থাপন না ঘটিলে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজমধ্যে অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য বেশভূষার ও পাশ্চাত্য আচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই আন্দোলনে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৈদেশিকের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপন ও বিদেশের আচার গ্রহণ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কি ফল ঘটিত, বোধ হয়, উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক্ সেই দর্প।

আচারবিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধরণত্ব অনুভব করি।

পাশ্চাত্যদেশে ফিলানথ্রপি নামে একটা পদার্থ আছে, তাহার বাঙ্গালা

নাম মানবপ্রীতি। এই মানবপ্রীতি কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে; সমস্ত মানবসমাজ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিকাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। এই লোক-হিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোক-হিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্যদেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয়, এবং অন্য কোন মূর্ত্তিধারণের সুবিধা না পাইলে এই মানবপ্রীতির ও বিশ্ব-হিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে স্ফূর্ত্তির বশে ইংরেজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপন ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; আপনার নিজত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলানথ্রপিষ্ট্ বলা চলে না। বিদ্যাসাগরের লোক হিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বিদ্যাসাগরের লোক-হিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই, যেমন করিয়াই হউক, তাহার

প্রতীকার করিতে হইবে; একালের সমাজতত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায় তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে, ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব ঘটিত ও সমাজতত্ত্ব ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন, পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন্ ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব। তাঁহার জীবনচরিত-লেখকেরা যেগুলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই পড়িতে পড়িতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শ্রোতৃবর্গ ভয় পাইবেন না, আমি সেই ফর্দ্দ এক্ষণে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দ্দের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বইটা কার্য্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানব প্রীতির অঙ্গীভূত।

ইউটিলিটির হিসাবে ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ইউটিলিটির হিসাবটা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সমাজের স্থিতির ও গতির নিয়মগুলা এতই জটিল যে, সেই নিয়মগুলাকে যতই আয়ত্ত করিতে পারা যায়, তাহারা ততই যেন হাত হইতে পিছলিয়া

পড়ে। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা যত অধিক হইতেছে, সমাজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। একটা অকর্ম্মণ্য, অলস, কুচরিত্র ব্যক্তির আহার দিয়া প্রাণ বাঁচাইলে আমাদের পরিমিত খাদ্যসমষ্টির পরিমাণ অকারণে হ্রাস করা হয়, এবং মনুষ্যজাতির জীবনসংগ্রামকে কিয়ৎ পরিমাণে আরও তীব্র করিয়া তোলা হয়, এই হিসাবে এইরূপ দয়া প্রকাশ গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া আজকাল-কার অনেক সমাজতাত্ত্বিক নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দয়াপ্রকাশ ব্যাপার কত দিকে কত উপায়ে গৌণভাবে ও পরোক্ষভাবে শুভফলের আনয়ন ও উৎপাদন করে, তাহা আমাদের স্থূল হিসাবে ধরা পড়ে না, কাজেই ইউটিলিটির জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে শূন্য পড়িয়া যায়। রাজশাসন ও সমাজশাসন ও ধর্ম্মের শাসন, লোকাচার ও দেশাচার, নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, বিদ্যার বিস্তার, ও জ্ঞানের বিস্তার, সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়া সহস্র গির্জ্জাঘর ও সহস্র কারাগার ও সহস্র বিদ্যালয় ও সহস্র ধর্ম্মাধিকরণ মনুষ্যের জীবনসমরের উৎকটতার লাঘবসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ব দুঃখের সহিত বলিতেছি, এই যুগযুগান্তরব্যাপী মনুষ্যের সমবেত চেষ্টার একমাত্র ফল নিষ্ফলতা। মনুষ্য-চরিত্রে স্বার্থপরতার মাত্রা কোনরূপে কমাইতে না পারিলে, বোধ করি, এই দ্বন্দ্বের ভীষণতার কোনরূপ লাঘব হইবেনা। সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে, কোনরূপ ক্ষতিলাভ গণনার বা কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র যদি কখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, সেই স্নেহাকৃষ্ট জননীর মত দুঃখক্লেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের আশা করিতে পারা যায়। অনেক হিসাব নিকাশ জমাখরচ বিচারের পর কর্ত্তব্য-নির্ণয় একরূপ ব্যাপার; আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক প্রণোদিত ও

তাড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়া আর এক রকম ব্যাপার। এই শেষোক্ত স্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিটা স্বভাবের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, উহাকে স্বভাব হইতে আর পৃথক্ করিয়া লওয়া চলে না; পৃথক্ করিতে গেলে সমগ্র স্বভাবটাই ভাঙ্গিয়া যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষে পরের কাজ করে, কেন না, পরের কাজটা ভাল কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ, উহাতে নিজেরও লাভ আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে. এবং হয় ত ইহলোকের পর আর একটা যে লোক আছে শুনা যায়, সেইখানে. এই কাজের জন্য বিশেষ প্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় জলার্থী হয়, শারীর-বিজ্ঞানঘটিত কোন তত্ত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না, এমন কি, ক্ষুধার ও পিপাসার তাডনায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে, শারীরবিজ্ঞান তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার এই কার্য্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে, তাহা চিন্তা করিতে সে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখন এইরূপ দিন আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্যকে পরের কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয় ত রাজশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্ম্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারাগার ও গির্জ্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্র-শালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে। মনুষ্যের ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কি না জানি না; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্ম্মের কল্পনা অন্ততঃ একটা দেশের মানবমস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে দেশের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের

নায়ক ভগবান্ রামচন্দ্র এই নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নীকে কর্ত্তব্যবোধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারক ভগবান্ সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখ যাতনা হইতে মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণার্থ রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ না করিয়া পারেন নাই, যে দেশের উপাস্য মানবদের শ্রীকৃষ্ণ এই নিষ্কামধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসন্তানগণের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই, তাহা সম্ভবে। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল ; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতে-ছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যা-সাগর কাঁদিয়া আকুল, কোন বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষস্থলে গঙ্গা প্রবাহমানা, ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও

কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব, এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যতা। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচ্যদেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তাচ্ছীল্য করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্য উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ু-প্রবাহে ক্রমসানুমানের মধ্যে ক্রমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমানই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, বামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিতলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। তবে সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্ব এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সমুদ্রতলে সার জন লরেন্স* ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়ার

* এই নামে একখানা জাহাজ ৭০০ যাত্রিসহ কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার সময় বাত্যাবর্ত্তে পড়িয়া সমুদ্রে মগ্ন হয়।

মালিক কিরূপ করুণা প্রকাশ ও মঙ্গল সাধন করিলেন, এক নিশ্বাসে তিনি তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। বস্তুতই দুঃখদাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্ত্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রাত কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না। এমন দিন কবে আসিবে, যে দিন মনুষ্যসমাজ সাম্প্রদায়িক কোলাহলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; যে দিন আপামর সাধারণ বিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগরের অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে মন দিতে অবকাশ লাভ করিবে।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। সমাজসংস্কারের কথাটা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের নিকট মার্জ্জনার ভিখারী হইতেছি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একবার না তুলিলেও চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথপ্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত, দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যাথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত সমাজবিহিত অত্যাচার, তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়! ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং

ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখ দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে। বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই।

এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

কিন্তু এই সমাজসংস্কার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহের হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে তিনি পিতামাতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিধবাবিবাহে শাস্ত্রীয়তা প্রতি-পাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে চিন্তনীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা নীতিশাস্ত্র হইতে 'মরাল কারেজ' নামক একটা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি।* কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রবোচনায় স্বার্থবিসর্জ্জন ব্যাপারটা যে কোন দেশের একচেটিয়া নহে, তাহা সদা সর্ব্বদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীনা ভারতভূমিতেও এই কর্ত্তব্যের জন্য স্বার্থ-বিসর্জ্জনের উদাহরণ ভূরি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় যে, অন্যত্র যে সব ঘটনার ঢক্কানিনাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব্ব জিনিষ। আরও দুঃখের বিষয় যে, একালের শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কি একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সংসারের হাইড্রলিক প্রেসের চাপ

* Moral courage.

পড়িয়া ইহা অনেকটা সঙ্কুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, কিন্তু শিক্ষানবিশ বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাষ্টার মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই মরাল কারেজের প্রতি বিশেষ বাজি ছিলেন না। স্বাধীন আত্মাকেও কোন স্থানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা তিনি জানিতেন। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বল্গা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না, কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্তদেবের তুষ্টির জন্য সময়বিশেষে আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন; তাঁহার ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না। কিন্তু মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, যখন সেই মুক্তবায়ুমার্গে বিহারপ্রয়াসী স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, ইহা তিনি মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়াস নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল,—মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃতি আপন হাতে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তিনিহত ক্ষুদ্র জীবনকে সমাজরূপী বিরাটপুরুষের ঐতিহাসিক জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এই প্রেমের শিকল ও ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়, "মণিমুক্তার মোহন মালা" ইহার নিকট স্থান পায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজল আমাদের পাষাণহৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না, তাই আমরা ভণ্ডব্রহ্মচর্য্যার মলিন পাংশুবিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখমোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের

জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, ইহাই প্রকৃতির নির্ব্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল,—কেন না,ইহা বিধিলিপি।

এই দেশাচারগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের বিশ্বাস যে প্রাচীনকালে একদিন জন কয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য দেশাচার সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং জনসমাজ ভয়ে হউক বা নির্বুদ্ধিতায় হউক, সেই সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজ-কাল সমাজ-শরীরের সহিত জীব-শরীরের তুলনা করা এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীবশরীরোদ্গত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনা করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীর মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজশরীরের অন্তর্ভুক্ত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত বলিতে পারা যায় না। সমাজশরীরের বয়ঃক্রমানুসারে তাহারা জৈবিক নিয়ম মতেই আপনা হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজশরীরকেও ঠিক জীব-শরীরের মত দুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়, এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসফলে তাহাতে বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ হয়। জীবশরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়। শরীরবিজ্ঞানে তাহাদিগকে vestigial organ. আখ্যা দেয়। এই ক্ষুদ্র অবয়ব-গুলায় জীবনধারণে ও জীবন রক্ষণে কোনরূপ উপকার দেখা যায় না;

বরং সময়ে সময়ে তাহারা জীবনের সংহারক হইয়া উঠে। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের নিরর্থক, অনাবশ্যক অস্তিত্বরক্ষার জন্য সমগ্র দেহের নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। ইহারা জীবন যাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিস্ফোটকের বা ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, তখন তাহারা জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, তখন তাহারাও জীবনের আনুকূল্যসাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃ-প্রকৃতির সহিত যুদ্ধব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সহ তাহাদের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কাজেই তাহাদের অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সমাজ-শরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা যেন সেইরূপ। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল, এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সময়সাপেক্ষ, এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজ-শরীরের চিকিৎসক তুমি বিস্ফোটকভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্ব্বত্র সুফল নাও হইতে পারে।

আমার যে সকল বন্ধুবর্গের অনুগ্রহবশে আজি আমি বিদ্যাসাগরের চরণোপান্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অবকাশ পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই, এবং কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা

করিয়া যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ ভুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মত মহাশয়গণের স্পর্শে যিনি কখন আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, যিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁহার চরিত্রের কোন একটা দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমস্ত সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ব্যক্তিগত হইলেও তাহা বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যে তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর। মহাকবির বাক্য আছে, যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে। মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যে সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্ম্মবহুল জীবনের অন্যতম ব্যবসায় ছিল, সেই সময়ে আমার পিতামহের ক্ষুদ্র কুটীর একদিন বিদ্যাসাগরের পাদস্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবকালে সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানাকথা অন্তঃপুরবাসিনীগণের মুখেও শুনিতে পাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশলাভের পর বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তক পরম্পরার শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা, ও লেখাপড়া ও ছাপার বহি পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কিরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি ও পরিচ্ছদ ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অন্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগরমূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিয়াছিল। বটতলার পুস্তকে বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পরুষমূর্ত্তি এক ব্যক্তি আমাদের

পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত। শ্রোতৃগণ মার্জ্জনা করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তরকালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর এই বিষম সমস্যার মীমাংসার ভার থাকিল। ১২৮৮ সালের ২১শে মাঘ তারিখে আমি কলিকাতা সহরে আসি; এবং ২৩শে তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের সহিত পিতৃব্যদেবের সমভিব্যাহারে চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগরদর্শনলালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। শৈশবকালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কিনা, সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটি বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজি পর্য্যন্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে। আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। আমাদের এই দুর্দ্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবন সঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না! কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্ত্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নূতন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই মহাপুরুষকোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃতজাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?
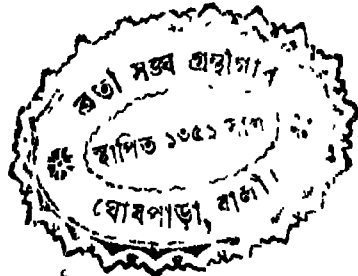
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বার বৎসর অতীত হইল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্যামাঙ্গিনী জননীর অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এতদিন আমরা তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থে কোনরূপ আয়োজন আবশ্যক বোধ করি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে এতদিন জাগে নাই, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক। বার বৎসর পরে যদি সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া থাকে, সেই প্রবুদ্ধিসাধনে আমাদের কৃতিত্ব বিচার্য্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কোন তপোলোকে বা সত্যলোকে অবস্থিত হইয়াও মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার দুঃখিনী জননীকে আজও ভুলিতে পারেন নাই,—সেইখানে বসিয়া "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে" বলিয়া কাতরকণ্ঠে গান গাহিতেছেন,—আর মানবের অশ্রুতিগোচর সেই সঙ্গীত সপ্তকোটি কণ্ঠে কলকলনিনাদ উত্থাপিত করিয়া বঙ্গভূমিকে জাগ্রত করিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি আজ যদি জাগিয়া থাকে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে জাগাইয়াছেন, আমাদের উহাতে কোন কৃতিত্ব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উপাসনার জন্য আজিকার সভা আহূত হইয়াছে, এবং যাঁহারা এই উপাসনার আয়োজন করিয়াছেন এবং এই উপাসনা-কর্ম্মকে সম্ভবতঃ সাংবাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা, কি কারণে জানিনা, আজিকার অনুষ্ঠানের প্রধান ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তিপ্রকাশের অবসর লাভ

করিয়া আমি যুগপৎ গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু যোগ্যতর পাত্রে এই ভার অর্পিত হইলে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বঞ্চিত হইতে হইত না। কেবল যে সময়োচিত বিনয় প্রকাশের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে, বঙ্কিমচন্দ্র যে বিস্তীর্ণ বঙ্গীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া তাঁহার সহবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনুচরগণের পথপ্রদর্শক হইয়া গিয়াছেন, আমিও সেই বঙ্গীয়সাহিত্য-ক্ষেত্রের এক প্রান্তে এক সঙ্কীর্ণ পথ আশ্রয় করিয়া মন্দ-গতিতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছি ; ইহাই আমার জীবনের কাজ ও ইহাই আমার জীবিকা ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোক বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রের যে যে অংশ প্রদীপ্ত করিয়া-ছিলেন, সেই সেই অংশে আমার "প্রবেশ নিষেধ"। আমি দূর হইতে সেই আলোকের উজ্জ্বলদীপ্তিতে মুগ্ধ হইয়াছি মাত্র, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যবান্ সহচরগণের ও অনুচরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেও আমি অধিকারী নহি। আজিকার আয়োজনের অনুষ্ঠাতাদিগের অনুগ্রহ জন্য অকপট কৃতজ্ঞতা স্বীকারে আমি বাধ্য আছি, কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনারা তাঁহাদের পাত্রনির্ব্বাচনে বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না।

বাঙ্গালীব জীবনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র কত দিকে কত উপায়ে প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালার সার ওয়াল্টার স্কট্ মাত্র। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয় অতি অল্প বয়সেই ঘটিয়াছিল, সে বয়সে উপন্যাস গ্রন্থের সহিত আমার পরিচয় বড় একটা স্পৃহনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল এবং আমি বঙ্গদর্শনের কয়েক সংখ্যা হইতে বিষবৃক্ষের দুইচারিটা পরিচ্ছেদ আত্মসাৎ করিয়াছিলাম, সেই বয়সে বিষবৃক্ষের সাহিত্যরসের কিরূপ আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই ; তবে এ কথা বেশ মনে আছে যে, পাঠশালায় গিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভূগোল-

বিবরণের ভারতবর্ষের অধ্যায়ে গঞ্জাম গঞ্জাম, চন্দ্বরপুর, মসলিপটম মসলি-পটম, আর্কট আর্কট, মদুরা মদুরা, টিনিভেলি টিনিভেলি প্রভৃতি অপরূপ স্বশ্রাব্য নামাবলী আবৃত্তির ক্রটি ঘটিলে পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট বেত্রাঘাত উপহার পাইয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ দাঁড়াইয়াছিল নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন নিতান্তই তাহার সমর্থন ও পোষণ করে নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, ‘পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে’ এই পরিচ্ছেদের সহিতই আমার তৎকালিক বিষবৃক্ষ পাঠ সমাপ্ত হয় এবং ঐ পরিচ্ছেদের শীর্ষস্থিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি মনের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া কিছুদিনের জন্য একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খার সৃষ্টি করে। কিছুদিনের জন্য মাত্র, কেননা পর বৎসর আমি পাঠশালার পরীক্ষায় যে পুরস্কার পাইয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার রাঙা ফিতার বন্ধনের মধ্যে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ নামক দুইখানি পুস্তক রহিয়াছে। এই সভাস্থলে যাঁহারা পিতার বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকের গৌরবযুক্ত পদবী গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুনিয়া আতঙ্কিত হইবেন যে, ঐ পুরস্কার বিতরণে গ্রন্থনির্ব্বাচনের ভার আমার পিতৃদেবের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনিই আমার গঞ্জাম গঞ্জাম চন্দ্বরপুর প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভৌগোলিকতত্ত্বে পারদর্শিতার পুরস্কার স্বরূপ ঐ দুইখানি গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নবম বর্ষের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরস্কার হস্তে বাড়ী আসিয়া রাত্রিটা এক রকমে কাটাইয়াছিলাম, পরদিনে বিষবৃক্ষ ও তার পরদিনে দুর্গেশনন্দিনী টাইটেল-পেজের হেডিং মায় মূল্য পাঁচসিকা হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক রকমে উদরস্থ করি। ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা যদি এখন অকপটে বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার কাব্য, রসগ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন না। বিষবৃক্ষের মধ্যে যেখানে ছেলের পাল "হীরার আয়ি বুড়ি হাঁটে গুড়ি গুড়ি" বলিয়া সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন

করিয়াছিল ও বৃদ্ধা ইষ্টিরসনামক ব্যাধির প্রতিকারবিষয়ে কেষ্টরস নামক ঔষধের উপযোগিতাসম্বন্ধে প্রতিবেশিনীর সহিত আলাপ করিতেছিল, সেই স্থানটাই গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পাত্র স্থির করিয়াছিলাম, ইহাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। আশমানির ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্‌গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন এবং তাঁহার শীর্ষরক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হরের ডাল বিগলিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, বাঙ্গালাসাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ, এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্‌গজের মত শতদলকমল যখন বিদ্যমান আছে তখন গঙ্গারাম গঙ্গারাম চম্বরপুরের কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমলচয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।

ঔপন্যাসিক-বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে এত লোকে এত কথা কহিয়াছেন যে, আর সে বিষয়ে কোন কথিতব্য আছে কি না, আমি জানি না। কথিতব্য থাকিলে আমি কোন কথা বলিতে সাহস করিব না। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত দাবি করিবেন যে, আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমি সূর্য্যমুখীর ও ভ্রমরের চরিত্র আর একবার সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া উভয় চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনে বাধ্য আছি। যদি কেহ এইরূপ দাবি রাখেন, তাঁহার নিকট আমি ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। বাঁকনল আর টেষ্টটিউব হাতে দিয়া নানাজাতি কিম্ভূত কিমাকার দ্রব্যের বিশ্লেষণ আমার ব্যবসায় বটে, কিন্তু মানবচরিত্র বা মানবীচরিত্র বিশ্লেষণে আমার কিছুমাত্র শিক্ষা বা দক্ষতা নাই; কেন না, নভেলবর্ণিত মানবচরিত্র বিশ্লেষণে সলফরেট হাইড্রোজানের কিছুমাত্র উপকারিতা নাই, ঐ মানবচরিত্র নমনীয়ও নহে, দ্রবণীয়ও নহে এবং জলে দ্রব করিয়া উত্তাপ প্রয়োগে উহার

ভাস্বরতাপাদনও অসম্ভব। আর আমার কাব্যরসগ্রাহিতার যে নমুনা দিয়াছি তাহাতে আপনারাও আমার নিকট সে আশা রাখেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সম্বন্ধে একটা স্থূল কথা আমার বলিবার আছে, সেই কথাটা সংক্ষেপে বলিয়াই আমি আপনাদিগকে রেহাই দিব।

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা বলেন, মানবসমাজের সুখ-দুঃখ রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি এবং ভালবাসাবাসি যথাযথরূপে চিত্রিত করাই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য; উহাতে কল্পনার খেলার অবসর নাই। ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, পাপপুণ্যের ফলাফলের তারতম্য দেখাইয়া সমাজের নীতিশিক্ষার ও ধর্ম্মশিক্ষার বিধানই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনে সফলতা দেখিয়াই নবেলের উৎকর্ষ বিচার করিতে হইবে। ইঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে যেমন ভট্টিকাব্য, ইঁহাদের মতে ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে তেমনি নবেল, কাব্যের ছলনা করিয়া পাঠকগণকে কাঁদানই নবেল রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসমাজের যথাযথ চিত্র আঁকিতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, আর নীতি-শাস্ত্র অতি সাধুশাস্ত্র, ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা মনে করিয়া লইতে পারি—নবেল এক কাব্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল নীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।

সৌন্দর্য্যেরও প্রকারভেদ আছে, গাছপালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, গুপ্তকথার হরিদাসও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎ-সংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথমশ্রেণীর কবি। গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না; সেটা দার্শ-নিকের ও বৈজ্ঞানিকের ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদের কাজ, কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া

দেখাইতে পারিলেই কবি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নবেলের মধ্যে সেই রকম গোড়ার কথা দুই একটা সুন্দর করিয়া দেখান হইয়াছে; এইজন্য কবির আসনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ।

মানব জীবনের একটা গোড়ার কথা এই যে, উহা আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টামাত্র। শুধু মানবজীবনের কথাই বা বলি কেন, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের নামই জীবন। যাঁহারা হার্বার্টস্পেন্সার-প্রদত্ত জীবনের এই পারিভাষিক সংজ্ঞা জানেন, তাঁহারা আমার কথায় সায় দিবেন। জীবনের উহা অপেক্ষা ব্যপকতর সংজ্ঞা আমি দেখি নাই। যাহার জীবন আছে, তাহাকে দুই দিকের টানাটানির মধ্যে বাস করিতে হয়। ধবলগিরিপর্ব্বত বহুকাল হইতে বরফের বোঝা মাথায় করিয়া ভারতবর্ষের পুরুষপরম্পরা অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র তাঁহার সজীবতায় সন্দেহ করেন। ধবল-গিরি এত মহান্ হইয়াও শীতাতপের ও জলবৃষ্টি ও তুষারবৃষ্টির উৎপাত অকাতরে সহিয়া আসিতেছেন, এবং শত স্রোতস্বিনীর সহস্র ধারা তাঁহার কলেবরকে শীর্ণ ও বিদীর্ণ ও ক্ষীণ করিয়া তাঁহার অভ্রভেদী মস্তককে সমভূমি করিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই আপন্নিবারণের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই। কিন্তু সামান্য একটি পিপীলিকা ক্রমাগত আহার-সংগ্রহ করিয়া আপনার ক্ষয়শীল দেহের পূরণ করিয়া থাকে, এবং যদি কেহ তাহাকে দলিত করে, সে দংশন করিয়া আত্মরক্ষণে সাধ্যমত ত্রুটি করে না। একদিকে বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে টানিতেছে, অন্যদিকে সে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে। তাহার কীটজীবন এই চেষ্টার পরম্পরামাত্র। যেদিন সেই চেষ্টার বিরাম, সেইদিন তাহার মৃত্যু। মানুষও সেই পিপীড়ার মতই জীবন ব্যাপিয়া আপনাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার জন্য ব্যাপৃত। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে বহিঃপ্রকৃতির আক্রমণনিবারণে সমর্থ

করিয়া মৃত্যুনিবারণের ধারাবাহিক চেষ্টাই তাহার জীবন। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে পণ্ডিতলোকে অর্দ্ধত্যাগে বাধ্য হন; তাই মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া পণ্ডিত-জীব আপনার অর্দ্ধেককে অপত্যরূপে রাখিয়া অপরার্দ্ধকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে জীবনের কিয়দংশরক্ষার জন্য এই অপত্যোৎপাদন। আহার, নিদ্রা, প্রভৃতি প্রবৃত্তির একমাত্র উদ্দেশ্য যেন-তেন প্রকারেণ জীবনরক্ষা। জীবনরক্ষার দুই উপায়, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। পশুর সহিত নরের এই স্থলে সামঞ্জস্য, কাজেই ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা পাশবপ্রবৃত্তি বলিয়া থাকি।

কিন্তু মানুষের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ অতি দুর্ব্বল পশু, সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, সেই দলের নাম সমাজ। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশব প্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থে মানুষ সেই পাশব প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। সহজাত সংস্কারের অভাবে অতীতের অভিজ্ঞতায় ভর দিয়া, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক পাশব প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হয় এইজন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম ধর্ম্মবুদ্ধি, ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম্ম। ইহা সমাজরক্ষার অনুকূল, ইহা লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত দুই টানাটানির ব্যাপার, উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্ম-রক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি, তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে, আর মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধির যাহা মুখ্যতঃ সমাজরক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল; গৌণতঃ আত্মরক্ষার অনুকূলমাত্র তাহা মানুষকে অন্যদিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মানুষকে এই দুই টানা-টানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্যবিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়।

সামঞ্জস্য স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতিক জীবন। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। এইখানেই মানুষের গোড়ার গলদ; original sin, এইখানেই অমঙ্গলের মূল, সংসার-বিষবৃক্ষের বীজ। Origin of evil, মানবজীবনের উৎকট রহস্যে ইহাই গোড়ার কথা। খোদার সঙ্গে সয়তানের চিরন্তন বিবাদের মূল এইখানে। মনুষ্যের হৃদয় সেই জীবনব্যাপী মহাহবের কুরুক্ষেত্র,—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি উপন্যাসে এই গোড়ার কথাটার আলোচনা করিয়াছেন। সেই মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া মানবহৃদয় কিরূপ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া থাকে; তাহা তিনি সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি।

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, আর কৃষ্ণকান্তের উইল, এই চারিখানি উপন্যাসের কথা আমি বলিতেছি। এই চারিখানি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রতাপ ও নগেন্দ্র, অমরনাথ ও গোবিন্দলাল, সকলেই কুসুমসায়কের লক্ষ্য হইয়াছিলেন, ধর্ম্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতার তারতম্যানুসারে কেহ বা জয়লাভ করিয়াছিলেন, কেহ বা পারেন নাই। বীর্য্যবন্ত প্রতাপ সারাজীবন প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর ও নীরব সাধনার বিষয় জগতের লোকে জানিতে পারিয়াছিল। মোহমুগ্ধ অমরনাথ আপনার পিঠের উপর আকস্মিক পদস্খলনের স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দম্ভের বলে পরবর্ত্তী জীবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইয়াছিলেন, পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথ আপনার আত্মাকে ছিন্ন-ভিন্ন বিদীর্ণ করিয়া অনাথা পিতৃহীনা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশের ফলভোগ করিয়াছিলেন; আর সর্ব্বাপেক্ষা কৃপাপাত্র গোবিন্দলাল সর্ব্বতোভাবে

আপনার অনধীন ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া আপনাকে কলঙ্কহ্রদে নিমগ্ন করিয়া অবশেষে অপমৃত্যুদ্বারা শাস্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই চারিটি মনুষ্যের বিভিন্ন দশার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমরা কখনও মানবচরিত্রের মহিমা দেখিয়া স্পর্দ্ধিত ও গর্ব্বিত হইতে পারি, কখনও বা জাগতিক শক্তির সম্মুখে মানবের দৌর্ব্বল্য দেখিয়া ভীত হইতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা--এই গোড়ার কথা—অতি সুন্দর চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন এবং সেইজন্য তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি। আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্যহস্ত আমাদের জাতীয় জীবনকে যেরূপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চস্থানে অবস্থান করুন বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্ত্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব, ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কত দিক্ হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরেজিতে একটা বাক্য চলিত হইয়াছে, যাহার মূলে গ্রীক্ নাই, সে জিনিষ জগতে অচল। বলা বাহুল্য, এখানে জগৎ অর্থে কেবল পাশ্চাত্য দেশ বুঝায়। আমরা যদি ঐ বাক্যকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলি যে, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিষ বাঙ্গালাদেশে অচল, তাহা হইলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজি গতিবিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে, মোমেণ্টম, বাংলায় উহাকে "ঝোঁক" শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিষকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিষ বাঙ্গালা দেশে চলিতেছে। সেই জিনিষগুলা গতি উপার্জ্জনের জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল, তাহার পর আর উহা থামে নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে নবেলের কথাটাই ধরা যাক্। বঙ্কিমবাবুর

পূর্ব্বেও অনেকে বাঙ্গালা নবেল লিখিয়াছিলেন ; তাহাতে কিসের যেন অভাব ছিল। ইংরেজিনবিশ অনেক লেখক ইংরেজি নবেল অনুকরণে বাঙ্গালার নবেল লিখিয়াছেন, কিন্তু কি একটা অভাবের জন্য উহা বাঙ্গালা সাহিত্যে লাগে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নবেল লিখিলেন আর একদিনেই বাঙ্গালায় সাহিত্যের একটা নূতন শাখার সৃষ্টি হইল। স্রোতস্বতীর যে ক্ষীণাধারা প্রবাহিত হইতেছিল, এখন উহা নূতন পথ পাইয়া বিপুলকায় গ্রহণ করিয়া শত উপশাখার সৃষ্টি করিয়া দেশ ভাসাইয়া জলপ্লাবন উপস্থিত করিল। সকলেই জানেন যে, এই জলপ্লাবনে সাহিত্যক্ষেত্র ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার অধিকাংশ নবেলই অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য ; কিন্তু ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দায়ী নহেন। ইহাতে দেশের দারিদ্র্যের ও দুরবস্থার পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের ইহাতে অঙ্গহানি হয় না। এখন হয়ত বাঁধ বাঁধিয়া দেশকে এই প্লাবন ইহাতে রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দিনে সেইরূপ বাঁধ বাঁধিবার কোন উপায় দেখি না। বঙ্কিম-চন্দ্রের পর যাঁহারা নবেল লিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকেই কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আমাদের এতটা আতঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমরা এদেশের মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বেও অনেক মাসিকপত্রিকা বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কি-যেন-কি একটার অভাব ছিল, তাই তাহারা সাহিত্য-সমাজে প্রভুত্ববিস্তার করিতে পারে নাই। বঙ্গদর্শনেই প্রথমে ভবিষ্যতের মাসিকপত্রের রচনানীতি ও সঙ্কলনরীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল, তদবধি সেই রীতি মাসিকপত্রের সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাসিক পত্র দাঁড়াইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণা পাইয়াই মাসিকপত্র বঙ্গসাহিত্যে চলিতে লাগিল।

নবেলের মত এই মাসিক সাহিত্যও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি। এক দেশের গাছের বীজ আনিয়া অন্য দেশে উহার চাষের চেষ্টা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। আজ ক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ বিদেশের দ্রব্য গ্রহণ করিব না বলিয়া আস্ফালন করিতেছে, কিন্তু বিদেশী জিনিষকে স্বদেশে স্থান দিতে ভারতবর্ষের কোনকালে আপত্তি ছিল না। আলুর বীজ ও পেঁপের বীজ বিদেশ হইতেই এদেশে আসিয়াছিল, এবং আফিমের জন্য ও তামাকের জন্য ভারতবাসী বিদেশের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ আছেন। অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিকে আপন ঘরে স্থান দিতে ভারতবাসী কস্মিন্ কালে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করিতে আমাদের কোনকালেই ঔদার্য্যের অভাব ছিল না। বিদেশের সকল বীজ এদেশের ক্ষেতে ধরে না, কিন্তু কোন কোনটা বেশ ধরিয়া যায়। কোন কোন বীজ ফলাইবার জন্য চাষের প্রণালীকে ক্ষেতের অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। নবেলের বীজ ও মাসিকপত্রিকার বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেই আসিয়াছিল, —যাঁহারা উহার আমদানি করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, সেদিন উহা জমিতে লাগিয়া গেল, এখন উহার শস্যসম্পত্তিতে সুজলা সুফলা বঙ্গধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আফিম এবং তামাক, এই দুই উপাদেয় ফসল এদেশের জমিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছে, নবেলের এবং মাসিকপত্রিকার শস্যসম্পৎ কিছুতেই তাহার নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে না।

বাঙ্গালীর নবেলসাহিত্যের ও মাসিকসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি তার অপেক্ষাও বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালাসাহিত্যে তাঁহার কোন্ কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন, এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়া

ছেন, অন্য কেহই সেরূপ হন নাই। বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া আমরা যে বড় হইতে পারিব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া বড় হইবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য দেশের ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালায় সাময়িকপত্র প্রচার করেন, বাঙ্গালায় বেদান্তশাস্ত্র প্রকাশ করেন, দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার জন্য দেশের লোকের অবোধ্য ভাষায় দেশের লোককে সম্বোধনের অদ্ভুত প্রণালী তাঁহার স্থিরবুদ্ধি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এমন কি, তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালাভাষায় প্রথম ও শেষ ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙ্গালীরা তাহা বুঝিতে পারে নাই; হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, হিন্দুস্থানে হিন্দুসন্তানের আশ্রয় বা অবলম্বন, হিন্দুসন্তানের জ্ঞাতব্য বা রক্ষিতব্য কিছুই নাই। বর্ব্বর জাতির প্রাচীন সাহিত্যে ক্ষীর-সমুদ্র ও দধিসমুদ্রের কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই সিদ্ধান্ত করিয়া লর্ড মেকলে এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা আনয়ন করিলেন। বিদেশের এই নূতন আমদানি শিক্ষাকে এদেশের লোকে সমাদরে গ্রহণ করিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে, এই বর্ব্বরের ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ধাক্কায় আমাদিগকে ঘর হইতে বাহিরে লইয়া পরের দ্বারে শিক্ষার্থিবেশে স্থাপিত করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে ডাকিয়া আনেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালাভাষাকে সংস্কৃত করিয়া উহাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে পুনঃসংস্কৃত করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজি লিখিয়া যশস্বী হইবার অস্বাভাবিক দুরভিলাষের বন্ধন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগের মুক্তি দিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিষ বাঙ্গালাদেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের সৃষ্টি প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই, তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাঙ্গালাভাষাকে স্নান করাইয়া তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেব দেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

আমার প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় সেদিন রাগের মাথায় তাঁহার বহু পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত ডিপ্লোমা-খানিকে চোতাকাগজ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপস্থিত প্রবন্ধলেখকেরও ঐরূপ একখানি কাগজ আছে, কিন্তু যখন উহার উপর নির্ভর করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছি এবং উহার বলেই আজি আপনাদের সম্মুখে দাড়াইতে সাহস করিতেছি, তখন ঐ কাগজখানির প্রতি ওরূপ অপভাষা প্রয়োগ করিতে চাহি না। এ বৎসর অনেকে বিলাতী লবণ খাইব না এই জেদ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের রক্তবিন্দুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে এখনও ঐ দ্রব্যের অস্তিত্ব ধরা পড়িবে। এতদিন ধরিয়া বিলাতী লবণ হজম করিয়া তাহার গুণ গাহিব না পণ ধরিয়া বসিলে নিমকহারামি হইবে। পাশ্চাত্যশিক্ষা হইতে আমরা কোন উপকারই পাই নাই, এ কথা পুরাদমে বলিতে পারিব না। পাশ্চাত্যশিক্ষা হইতে কিছু লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের সকলকেই অল্পবিস্তর মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল, ইহাও ততোধিক সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেতিহাস

যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই।

তবে বঙ্কিমের সহিত অন্যের এ বিষয়ে প্রভেদ আছে। নীর বর্জ্জন করিয়া ক্ষীরগ্রহণের ক্ষমতা এক রাজহাঁসেরই আছে। বঙ্কিমচন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্যনীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, আমাদের মত দাঁড়কাকের দ্বারা ততটার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কেবল ক্ষীরসংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতৃমন্দিরে আনন্দ-মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।

বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু 'প্রচারের' পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন। ভয়াবহ অভিধান দিয়া পরধর্ম্মকে নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে, ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌমিক এবং সনাতন অংশ আছে, তাহা সকল ধর্ম্মেই সমান, সে অংশটুকুতে কাহারও ভীত হইবার কোন কারণ নাই; কিন্তু ধর্ম্মের আর একটা অংশ আছে, তাহা দেশভেদে ও কালভেদে মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করে। ধর্ম্ম যখন লোকস্থিতির সহায়, এবং লোকস্থিতির নয়ন যখন বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন, তখন ধর্ম্মের এই অংশ দেশকালের অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন দেশেই মানবসমাজের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। একটা মানবসমাজ পার্শ্ববর্ত্তী মানবসমাজের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে আসিয়া তাহার সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হয়। কাজেই ধর্ম্মের এই অংশ দেশকালানুরূপ না হইলে উহা তদ্দেশে ও তৎকালে

লোকস্থিতির অনুকূল হয় না। তত্তৎদেশে ধর্ম্মের এই অংশের সহিত তত্তৎদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাচীনের সহিত সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন করিলে কোন সামাজিক ব্যবস্থাই কোন দেশে লোক-স্থিতির অনুকূল হয় না। যখন বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস বিভিন্ন পথে চলিয়াছে, তখন লোকস্থিতির অনুরোধে ধর্ম্মকেও আত্মসমাজের অনুকূল-মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হয়। এইখানেই আত্মধর্ম্ম ও পরধর্ম্মে ভেদ আসিয়া পড়ে। যে ধর্ম্ম এক সমাজে লোকস্থিতির অনুকূল সে ধর্ম্ম অন্য সমাজে অনুকূল না হইতে পারে। এইখানে এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মশব্দের লক্ষ্য কেবল রিলিজন্ নহে। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মশব্দের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক; মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম্ম,—দাতনকাঠির ব্যবহার হইতে ঈশ্বরোপাসনা পর্য্যন্ত সমস্তই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এই হিসাবে যাহা বিদেশীর ধর্ম্ম, তাহা ভারতবাসীর ধর্ম্ম হইতেই পারে না। ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস ও ইউরোপের আধুনিক সমাজতন্ত্র যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজতন্ত্রের সহিত এক নহে, তখন ইউরোপীয়দের ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে পরধর্ম্ম। উহাদের খ্রীষ্টানির কথা বলিতেছি না, উহাদের আইনকানুন, আহারবিহার, চালচলন, আদব-কায়দা সমস্তই আমাদের নিকট পরধর্ম্ম, আমাদের ধর্ম্মও তেমনি উহাদের নিকট পরধর্ম্ম, এবং বিনা বিচারে ও বিনা কারণে একের পক্ষে অন্যধর্ম্মগ্রহণ প্রকৃতপক্ষেই ভয়াবহ। সৌভাগ্যক্রমে এই পরধর্ম্মবাৎসল্যের মোহ শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার স্বজাতিকে আপন ঘরে ফিরিবার জন্য ডাক দিলেন, তখন আমরা আগ্রহের সহিত সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আজি আমরা যে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, বিশবৎসর পূর্ব্বেই সেই প্রত্যাবর্ত্তনের ডাক পড়িয়াছিল; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পথভ্রষ্ট স্বদেশবাসী সেই ডাকে সাড়া দিতে ঔদাসীন্য দেখায় নাই। আজ সেই ডাক আরও উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়াছে, এবং তপস্বী বঙ্কিমচন্দ্র

মর্ত্ত্যলোকের তপস্যার সমাধান করিয়া অদৃশ্য তপোলোক হইতে আমাদিগকে সেই পরিচিতস্বরে আবার ডাকিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কেহ apostle of culture বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমুদয় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য বিধানকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির অবিরত সামঞ্জস্যসাধনচেষ্টার নাম জীবন, এবং যখন সমুদয় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যবিধান না ঘটিলে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন ধর্ম্মই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়—"ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মই মানবজীবনকে রক্ষা করে, কেবল ব্যক্তির জীবন বা বংশের জীবন কেন, সমাজের জীবনও ধর্ম্মই রক্ষা করে, এবং যদি কেহ ঐহিক জীবনের উপর পারত্রিক জীবনের রক্ষাকেও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিতে চাহেন, তাঁহারও সহিত আমি আজ বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্কিমচন্দ্রপ্রযুক্ত ধর্ম্মের এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে উহা culture অপেক্ষা ব্যাপক হইয়া উঠে। এই ধর্ম্মের অন্বেষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আপন ঘরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গীতাশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই ব্যাপক অর্থে ধর্ম্মশব্দ প্রয়োগ করিলে সার্ব্বভৌমিক ও প্রাদেশিক উভয় ধর্ম্ম উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে; এবং বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বা প্রাদেশিক যুগধর্ম্মের অন্বেষণের জন্যও আমাদিগকে পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে না। আজ গীতার সুলভ সংস্করণ লোকের পকেটে পকেটে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরেজিশিক্ষিত লোকের মধ্যে উহা বিরলপ্রচার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে, বাঙ্গালাদেশে সে জিনিষ অচল থাকে

না, তাহা প্রচলিত হয়; তাই বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন "নব জীবন" ও "প্রচার" আশ্রয় করিয়া বঙ্গবাসীকে তাহার আপন শাস্ত্রের সহিত পরিচিত করিলেন, সেইদিন হইতে সেই শাস্ত্র কথা বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিতসমাজে চলিতে লাগিল। তদবধি উহা আর থামে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মুখে স্বদেশের শাস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে বঙ্গজননীর আর এক সন্তান বিশ্বজগতে পুরাণকবির চতুর্ম্মুখনিঃসৃত এবং ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের শ্রুতিপ্রবিষ্ট বাণীর মধ্যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরে বঙ্গজননীর আর একজন সন্তান ঈশোপনিষদ্‌গ্রন্থের পরিত্যক্ত পাতার মধ্যে সেই ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রুতিবাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বকীয় সামর্থ্যের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর যে জ্ঞানান্ধতা অপনোদন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের স্বদেশে জন্মিয়া ধন্য হইয়াছি। এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই যে, ঐ দুই মহাপুরুষের অনুবর্ত্তীরা ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য বিদেশে যাত্রা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন এবং অন্য দেশের অন্য জাতির শাস্ত্র হইতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সারসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপিপাসুর পিপাসা যদি তাঁহাদিগকে পানীয়-অন্বেষণে পৃথিবীভ্রমণে বাধ্য করে, তাহাতে দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই। এই বিদেশ-যাত্রীদিগের পরিশ্রমের জন্য আমরা তত দুঃখিত নহি, কিন্তু বিদেশের আকর্ষণে তাঁহারা স্বদেশী-সামগ্রীর প্রতি যদি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার জন্য ক্ষোভ করিবার হেতু আছে। যাহাই হউক, ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিদেশপর্য্যটন অনাবশ্যক হইলেও আমরা ঐ অনাবশ্যক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলাম, এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ডাক দিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই আহ্বান শুনিল ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠে ফিরিয়া আসিতে সঙ্কোচবোধ করিল না।

গীতাশাস্ত্র ধর্ম্মের কেবল সার্ব্বভৌমিক সনাতন অংশের উপদেশ দিয়া নিরস্ত হন নাই, প্রাদেশিক ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের তত্ত্বও ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কয়েকসহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী গীতাশাস্ত্রে যে সহস্রশীর্ষ পুরুষের মুখনিঃসৃত অভয়বাণী শুনিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সহস্র অক্ষি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশে নিবদ্ধ আছে। অতএব ঐ শাস্ত্রের উক্তির মধ্যে প্রাদেশিক ধর্ম্মের ও যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে না।

যুগধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন তিনি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মহাহবের যুগে কোন্ মূর্ত্তিতে সম্ভূত হইয়াছিলেন মহাভারতের মহাসাগর মন্থন করিয়া ভারতবাসীর নিকট লুপ্তপ্রায় সেই মূর্ত্তির উদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যত্নপর হইয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভগবানের যে মূর্ত্তিকে পূজার জন্য আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রে সংশপ্তক সেনার সম্মুখীন পার্থসারথির মূর্ত্তি নহে, তাহা বৃন্দাবনবিহারী গোপীজনবল্লভ বংশীবদনের মূর্ত্তি, তাহা নবনীতচোর উদূখলবদ্ধ বালগোপালের মূর্ত্তি; তাহা বৎসকুলের সহিত কেলিপর যমুনাপুলিনবিহারী গোপসখার মূর্ত্তি,—যে মূর্ত্তিতে ভগবান শ্রী-করধৃত মোহনমুরলীর প্রত্যেক রন্ধ্র শ্রীমুখমারুতে পূর্ণ করিয়া তদুদ্গত স্বরস্রোতে বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মস্থলে আনন্দের ধারা সঞ্চার করেন, উহা সেই মূর্ত্তি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ভারতবর্ষের উপাসকসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই; ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা মাধুর্য্যের উপাসনায় পক্ষপাতিতা দেখাইবে, ইহাতেও বিস্মিত হইব না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত

সাগর মন্থন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মূর্ত্তি; তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপকের মূর্ত্তি—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্ত্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্ররক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি, জীবনসংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি, লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি। যিনি বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত করুণাপ্রবাহের একমাত্র উৎস, তিনি যে কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই নিষ্করুণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবরক্তে বসুধা সিক্ত দেখিতে বাধ্য হন, তাহা তিনিই জানেন, মনুষ্যের শাস্ত্র এখানে মূক, অথবা এই মূর্ত্তিগ্রহ সেই সনাতনী মায়ার সহিত অভিন্ন,—যাহা হইতে এই বিশ্বজগতের জন্মাদি, যাহা হইতে জীবের জীবন, যাহা হইতে জীবনে বহিঃপ্রকৃতি সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা ঘটিতেছে, যাহা হইতে মানবের সকল দুঃখের নিদান সেই খৃষ্টানকথিত পাপপ্রবণতার উৎপত্তি হইয়াছে, অথবা কবির ভাষায় বলিতে পারি,—ইহা সেই আধ-সত্য, জ্ঞানী যখন তাঁহার আত্মার মধ্যে জগৎকারণের সন্ধান পাইবেন, যখন তিনি আপনাকেই এই জগদ্ভ্রান্তির কারণ বলিয়া জানিতে পারিবেন, যখন তাঁহার অপূর্ণ জগৎস্বপ্ন উদ্বোধনে বিলীন হইবে, তখন সেই মহাস্বপ্নভাঙা দিনে যে আধ-সত্য—

সত্যের সমুদ্রমাঝে হ'য়ে যাবে লীন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমরা এই যুগধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনের শেষভাগের প্রত্যেক কার্য্যই বোধ করি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে আমাদিগের নিকট যুগধর্ম্মের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং

যুগধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ভূমি মাতৃভক্তির জাহ্নবীজলে মার্জ্জিত করিয়া তাহাকে তাঁহার সিংহাসনস্থাপনের উপযোগী করিতে হইবে। তিনি যে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইবেন, তাহা পুণ্যতোয়ে অভিসিক্ত করা আবশ্যক।

আর্য্যজাতি

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, বিধাতা আপন মস্তক হইতে ব্রাহ্মণের, বক্ষোদেশ হইতে ক্ষত্রিয়ের উরু হইতে বৈশ্যের ও চরণ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করেন। পৃথিবীতে এই চারি ভিন্ন পঞ্চমজাতি নাই, এবং এই পুরাতন চারিজাতি মনুষ্য হইতে বর্ত্তমান সহস্রজাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। আর এক কথা এই চারিজাতি মনুষ্যের মধ্যে, ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ ও মাথার বলে শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ ও বাহুবলে শ্রেষ্ঠ; বৈশ্য পীতবর্ণ ও কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্য্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের দাসত্বই জীবনের একমাত্র অবলম্বন। জাতিভেদের মূলে এই বর্ণভেদ, এবং ভারতবর্ষের ভাষায় অদ্যাপি জাতিশব্দের পর্য্যায়ে বর্ণ।

কৌতুক এই যে, প্রকৃত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলে এই পৌরাণিক আখ্যানের কতকটা সমর্থন পাওয়া যায়। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে মোটামুটি চারি জাতিতে বিভাগ করিবার প্রথা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ককেশীয় জাতি, আর্য্যজাতি যাহার প্রধান শাখা, সেই জাতি আপনার শাদা চামড়া ও মোটা মাথা লইয়া অদ্যাপি পৃথিবী আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। আদিম আমেরিক তাম্র বা রক্ত-

বর্ণের জন্য ভূগোলবিবরণে বিখ্যাত; তাহাদের বাহুবলের জন্য সম্যক্ খ্যাতি আছে কি না জানি না, তবে মহাভাগ খ্রীষ্টানদিগের শুভ পদার্পণের পূর্ব্বে, আমেরিকার লোক মিশর, কালডিয়া ও গ্রীস হইতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক রহিয়াও বড় বড় সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসেই দেখিতে পাই। মোগলজাতীয় চীনাম্যানের প্রধান পরিচয় পীতবর্ণ, এবং শুনা যায়, এই চীনাম্যানই প্রথমে দিগ্দর্শন শলাকার তথা আবিষ্কার করিয়া সমুদ্রযাত্রা সুগম করিয়াছিল। আর মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি নিগ্রহের ও উৎপীড়নের ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যতই ব্যথিত হউক না, কৃষ্ণকায় কাফ্রি শ্বেতাঙ্গের দাস্যে জীবন অতিবাহিত কেন না করিবে, বর্ত্তমান শতাব্দীতেও সেটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকার যে এইরূপ একটা সঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কোন সংশয়ের কারণ দেখি না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, চারিবর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক্লবর্ণ মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা কতদূরে আসিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

বাল্যকাল হইতে আমরা মুখস্থ করিয়া আসিতেছি যে, ইংরেজ, গ্রীক ও জার্ম্মান, পার্শী ও হিন্দু, একই মানববংশে উৎপন্ন ও পরস্পর জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্বদ্ধবান্। এই প্রাচীন মানববংশ একটি বিশেষ সুগঠিত সুন্দর ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, একই দেবতার আরাধনা করিত, এবং কাস্পীয়সাগরের ধারে অথবা পামীর মালভূমির নিকটবর্ত্তী কোন দেশে অধিবাস করিত। কালক্রমে বংশবিস্তারসহকারে বা খাদ্যাভাবে বা পার্শ্বস্থ জাতির আক্রমণে আদিম বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কেহ

পশ্চিমে কেহ বা পূর্ব্বে যাত্রা করে, এবং কালক্রমে পশ্চিমে বৃটিশ দ্বীপ হইতে পূর্ব্বে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছাইয়া ফেলে। সেই সেই প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা এই বৈদেশিক অতিথির পদার্পণানুগ্রহে সর্ব্বত্র সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আপনাদের গরু ভেড়া ও বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত অতিথিসৎকারে নিয়োজিত করিয়াও নিষ্কৃতি পায় নাই। এমন কি, অধিকাংশ স্থলে আপনাদের অস্তিত্ববার্ত্তা পর্য্যন্ত এতদূর নিষ্কামভাবে লুপ্ত করিয়াছে যে, বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিস্তর আক্ষেপ ও গবেষণা সত্ত্বেও তাহার উদ্ধার হইতেছে না যাহাই হউক, শ্বেতকায়গণের এই আতিথ্যগ্রহণ স্পৃহাটা অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী রহিয়াছে, এবং এই ক্ষুদ্র কারখানার মধ্যেও অতবড় সাহারা দেশকে মরুভূমি ও মেরুপ্রদেশকে হিমভূমি করিয়া বিধাতা তাঁহাদের বাসস্থানের পরিধি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, বিধাতার এই কার্পণ্যের সুচারু কৈফিয়ত পাওয়া যাইতেছে না।

আমাদের পঞ্চনদবাসী পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে আর্য্যনামে অভিহিত করিতেন, এবং সার উইলিয়ম জোন্সের পর হইতে ইউরোপীয়েরাও আপনাদিগকে আমাদের জ্ঞাতি সাব্যস্ত করিয়া সেই নামে পরিচিত করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরেজদের জ্ঞাতিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত, এবং অপরের সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইংরেজেরা যে নিশ্চয়ই বানরের বংশধর, ডারুইনের মতের এইটুকু গ্রহণ করিতে আনন্দসহকারে প্রস্তুত আছেন। তথাপি বর্ত্তমান প্রস্তাবে ইংরেজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয়ের আর্য্যত্ব স্বীকৃত হইবে ও আর্য্যশব্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রদত্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

এই স্থলে ইউরোপীয়দের আর্য্যত্বে অধিকারবিষয়ক যুক্তির একটু আলোচনা আবশ্যক। প্রধানতম ও প্রবলতম যুক্তি ভাষাগত ঐক্য। ফলে ইংরেজ ও জার্ম্মাণ ও পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী একই ভাষায় কথাবার্ত্তা

কহিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ভাষাগত ঐক্যের মূলে শোণিতগত বা জাতিগত ঐক্য না থাকিলে এত বড় হেঁয়ালিরও কোন অর্থ হয় না। অপিচ ইংরেজের ভাষার ও বাঙ্গালীর ভাষার সাদৃশ্য ও ভেদ পর্য্যালোচনা করিয়া, যখন ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ একত্র পাশাপাশি অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা, কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়েরও কতকটা স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। এমন কি, এই ভাষাবিচার হইতে তাঁহাদের আদিম বাসস্থান পর্য্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে। তবে যেমন কোন সিদ্ধান্তেই সকল পণ্ডিতকে কখনও একমত গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই, এখানেও সেইরূপ দুইমত রহিয়াছে। আর্য্যভাষাসমুদয়ের ব্যবচ্ছেদ ও তুলনায় আলোচনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, আর্য্যজাতির প্রথম বাসস্থান ছিল কাস্পীয়সাগরের দক্ষিণে, আর কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, সুইডেনের উত্তরে। কাস্পীয়সাগর আর সুইডেন,—পুরাতত্ত্বে এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ দেখিয়া বিচলিত হওয়া কাপুরুষের কাজ।

এই ভাষাগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান আর্য্য-জাতীয় মনুষ্যগণকে ছয় প্রধান শাখায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ছয়ের মধ্যে চারি শাখা ইউরোপে, ও দুই শাখা এশিয়া মহাদেশে বসতি করিতেছে। ইউরোপে কেল্ট, টিউটন, গ্রীক-রোমান ও শ্লাব, এবং এশিয়া মহাদেশে পারসীক ও হিন্দু। এই ছয় শাখা আর্য্যজাতিরূপ মহাবৃক্ষ। ইহার মূল কাস্পীয়সাগরের দক্ষিণে বা সুইডেনের উত্তরে কোন স্থানে সংস্থিত ছিল। ইহার শাখা প্রশাখা সমস্ত ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ায় বিস্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সমস্ত ধরাতল ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। ধরাতল ইহার ছায়ার আশ্রয়ে "সুশীতল" হইতেছে, ইহার শোভা, ইহার ঐশ্বর্য্য, ইহার সমৃদ্ধি, পৃথিবীতে

তুলনাবিরহিত, তবে ইহার আওতা ক্ষুদ্র আগাছার পক্ষে ভয়ঙ্কর।

এই সিদ্ধান্তটা স্থূলতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত, ইহার যাথার্থ্যে সন্দিহান হইবার সম্যক্ কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কয়েকটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

অতি প্রাচীন কালে কোন দেশবিদেশে একটা বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত মানববংশ বসতি করিত, সেই বংশের ভিতর পরস্পরের মধ্যে শোণিত-গত ও জন্মগত সম্বন্ধ ছিল, অর্থাৎ তাহারা পীতবর্ণ মোগল ও কৃষ্ণকায় কাফ্রি ও তাম্রবর্ণ আমেরিক হইতে স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত জীব ছিল,—সেই জাতির নাম হউক "আর্য্যজাতি"। তাহারা একটা বিশেষ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত, সেই ভাষা সর্ব্বতোভাবে তাহাদের জাতীয় সম্পত্তি ও তাহাদের নিজস্ব ছিল,—তাহার নাম হউক "আর্য্যভাষা"। তদ্ভিন্ন আচার ব্যবহার নীতি ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের একটা স্থূল ঐক্য ছিল, অতএব সেই প্রাচীন ধর্ম্মের নাম হউক 'আর্য্যধর্ম্ম"। সেই আর্য্যভাষাভাষী আর্য্যধর্ম্মাশ্রয়ী আর্য্যজাতি কালে সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং অধুনাতন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মনুষ্যগণের অনেকে অদ্যাপি সেই প্রাচীন আর্য্যগণেরই বংশে জন্মিয়াছে, কাল-সহকৃত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সেই প্রাচীন আর্য্যভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহি-তেছে, এবং হয়ত সেই প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মকেই রূপান্তরিত করিয়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত স্থূলতঃ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে সূক্ষ্ম বিচারে কয়েকটা নূতন প্রশ্ন আসিয়া পড়ে ও তাহাদের উত্তরের দরকার হয়। সম্প্রতি যাহারা আর্য্যভাষায় কথা কহে ও আপনাদিগকে আর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, সকলেই প্রকৃত পক্ষে আর্য্যনামে অধিকারী বটে কি না? প্রাচীন আর্য্যজাতি পৃথিবী ছাইবার পূর্ব্বে কোন-না-কোন স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিত,

সে কোন্ স্থান? প্রাচীন আর্য্যজাতি কোন-না-কোন সময়ে প্রাচীন বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দিগন্তে বাহির হয়,—সে কোন্ সময়?

এ কয়টী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যে ভাবে উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু সন্দেহের কারণঃ জন্মে।

ভাষাগত ঐক্য ধরিয়া জাতিগত ঐক্য স্থাপন করিতে গেলে অনেক সময়ে ভুল হয়। ভাষা পরিবর্ত্তন পৃথিবীর ইতিহাসে নিত্য ঘটনা। আধুনিক ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়, সময়ে সময়ে এক একটা কুল অথবা এক একটা জাতি অকস্মাৎ আপন ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পরের ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিল। বিজিত জাতি বিজেতৃজাতির ভাষা গ্রহণ করিয়া অনেক সময়ে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করে। আধুনিক ফরাসী ও স্পানিস্ ভাষা লাটিন হইতে উৎপন্ন, কিন্তু ফরাসী ও স্পানিস্ জাতি রোমক জাতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তত্তৎ প্রদেশের অধিবাসিগণ রোমসাম্রাজ্যের অধীনতার সময়ে রোমক-দের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে আগত খাঁটি জার্ম্মাণ নর্ম্মানেরা ফরাসীর দেশে বাস করিয়া ফরাসী ভাষা গ্রহণ করে। ওয়েলশ ও আইরিশগণ ক্রমে আপন ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করিতেছে। কাফ্রি অনেক স্থলে শাদা প্রভুদের নিকট হইতে খ্রীষ্টানির সহিত ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকা দেশে লাল, শাদা ও কালা, এই ত্রিবিধ বর্ণসমন্বয়ে যে সকল অপূর্ব্ব সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা ইউরোপীয় ভাষায় কথা কহে। অথবা অধিক দূর যাইবারই বা প্রয়োজন কি, যখন আমাদের মধ্যেই অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে ও কথা কহিতে লজ্জা অনুভব করেন?

এই সকল দেখিয়া কেবল ভাষার সাহায্যে জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় ঠকিতে হয়। অমুক ব্যক্তি সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা

ভাষায় কথা বলে, অতএব সে আর্য্যসন্তান, অমুক ব্যক্তি ইংরেজি কহে, অতএব সে আর্য্য টিউটন, এরূপ বিচার অযুক্ত ও অসঙ্গত।

সুতরাং জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইলে অন্যায় পন্থার অবলম্বন আবশ্যক। মানুষে কোন্ ভাষায় কথা কহে, কেবল ইহা দেখিলে চলিবে না। গায়ের রঙটা কেমন, মুখখানা গোল না দীঘল, চুলগুলা কোমল না কর্কশ, চোখ কাল না কটা, নাক উঁচু না বসা, এই সকল দেখা দরকার হইয়া পড়িবে এবং এই সকল দেখিয়া মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমস্ত মানবজাতিকে কয়েকটি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি ইউরোপের সকল লোকেই আর্য্যভাষায় কথা কহে। কেবল পিরিনীস পর্ব্বতের নিকট বাস্ক নামে ক্ষুদ্র জাতি ও উত্তর রুশিয়ার লাপ জাতির ও ফিন জাতির কেহ কেহ যে যে ভাষায় কথা কহে, তাহা আর্য্য ভাষা নহে। স্থূলতঃ ইউরোপের সকলেই আর্য্যভাষাভাষী ও এই কারণে সকলেই আর্য্যজাতীয় বলিয়া গৃহীত হয়; কিন্তু আকার অবয়বের তুলনা করিলে বিভিন্ন প্রদেশে এত বিভিন্ন গঠনের লোক দেখা যায় যে, তাহাদের সকলেই এক বংশে উৎপন্ন বলিতে জীববিদ্যা রাজি নহেন। ইউরোপের দক্ষিণভাগে ভূমধ্যসাগরের তটবর্ত্তী দেশের লোকের আকৃতি কিছু খর্ব্ব, চুল কাল, চোখ কাল, বর্ণ অপেক্ষাকৃত ময়লা, মুখের অবয়ব কাহারও গোলাকার, কাহারও বা ঈষৎ দীর্ঘ। উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের গঠন অনেকাংশে পৃথক্; তাহাদের আকৃতিতে শালপ্রাংশুত্ব ও মহাভুজত্ব বর্ত্তমান, বর্ণ শাদা; বদনকে মণ্ডল বলিলে ভুল হয়, চুল পিঙ্গলবর্ণ অথবা ইংরেজি কাব্যের অনুরোধে সুবর্ণবর্ণ, আমাদের বিচারে কটা; চক্ষু নীল। আবার অনেক লোক দেখা যায়, তাহাদের গঠনে উভয় জাতির লক্ষণই কিছু না কিছু বিদ্যমান; ইহারা উভয় বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন,

তাহার সন্দেহ নাই এবং এই মিশ্রজাতীয় লোকের সংখ্যা ইউরোপের মধ্যভাগেই অধিক।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয়, ইউরোপের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ, তিনটা অথবা অন্ততঃ দুইটা বিভিন্ন বংশ হইতে উৎপন্ন। অনুমান হয়, উত্তর অঞ্চলের লোকেই স্থূলতঃ আর্য্য। সর্ব্বত্রই আর্য্যে অনার্য্যে অল্পবিস্তর মিশিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর সঙ্কর জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। খাঁটি অমিশ্র আর্য্যের বা খাঁটি অমিশ্র অনার্য্যের সংখ্যা আছে কি না, সন্দেহের স্থল।

ইংরেজেরা আপনাদিগকে আর্য্য টিউটন বলিয়া পরিচয় দেন। ওয়েলস, কর্ণওয়াল, স্কটলণ্ডের উত্তরভাগ ও আয়র্লণ্ডের পশ্চিম ভাগের লোক কেল্টিক ভাষায় কথা কহে ও আপনাদিগকে কেল্টিক আর্য্য বলিয়া পরিচয় দেয়। কেল্টিক ও টিউটনিক উভয়ই আর্য্য ভাষা, তবে উভয় ভাষায় কালক্রমে যতটা পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, কেল্ট ও টিউটনের শারীরিক গঠনে অবশ্যই ততখানি পার্থক্য জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। ভাষা যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, শরীরের গঠন তত শীঘ্র বদলায় না, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড, তিন প্রদেশের অধিবাসীদের একই রকম গঠন হওয়া উচিত, নতুবা উহাদের আর্য্যত্বে সন্দেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায়, তিন দেশেরই অনেক অধিবাসীর গঠনে আর্য্যত্বের লক্ষণ বিদ্যমান আছে। অনেক খাঁটি ইংরেজ অথবা আইরিশ, যাঁহারা বিশুদ্ধ আর্য্যভাষায় কথা কহেন, তাঁহাদের শরীর খাট, মুণ্ড গোল, চুল ও চোখ কাল;—দেখিলেই তাঁহাদের আর্য্যত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ইংলণ্ডের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই কয়টা কথা পাওয়া

যায়। অতি প্রাচীন কালে,—কত পূর্ব্বে তাহা সম্প্রতি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা চলে না,—ইংলণ্ডের সহিত ইউরোপের যোগ ছিল; মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান ছিল না। তখন ইউরোপে অতএব ইংলণ্ডে, খর্ব্বাকৃতি জাতিবিশেষ বাস করিত। তাহারা পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিত ও লড়াই করিত। কালে সমস্ত ইউরোপ এক বিশাল হিমানীস্তরে আবৃত হয়। এই আকস্মিক হিমোৎপত্তির কারণ কি, তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইউরোপের তদানীন্তন মনুষ্য এই হিমের দৌরাত্ম্যে অনেকাংশে লুপ্ত হয় বা স্থানত্যাগী হইয়া দক্ষিণমুখে ক্রমে পলায়ন করে। কালে হিমের আচ্ছাদন গলিতে থাকে, কালে সেই মহাদেশ-ব্যাপী বরফের আস্তরণের পরিধি সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। এখনও সেই হিমরাশি সর্ব্বত্র গলে নাই। এখনেও আল্‌পস পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগে সেই হিমরাশি পূর্ব্বের মত বর্ত্তমান। এখনও ইউরোপের উত্তরে মেরুপ্রদেশ সারা বৎসর সেই হিমস্তরে আবৃত থাকে। এখনও সমস্ত গ্রীনলণ্ড দেশ হিমে আচ্ছাদিত। ক্রমশঃ শীতের অপগমে ইউরোপ সেই হিমাবরণ হইতে মুক্তিলাভ করে; আবার জীবজন্তুর অধিবাসের উপযোগী হয়। প্রাচীন খর্ব্বকায় মনুষ্য হিমস্তরের পরাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ উত্তরমুখে অগ্রসর হয়। ম্যামথের অস্থির সহিত তাহাদের অস্থিপঞ্জর ভূস্তরমধ্যে নিহিত রাখিয়া যায়। এই সময়ে আর একটি জাতি আসিয়া দক্ষিণ ইউরোপ ছাইয়া ফেলে, এবং পূর্ব্বতন খর্ব্বা-কৃতি অধিবাসিগণকে আরও উত্তরে দূরীভূত করে। সেই অবধি ইউবোপে ইহাদের আর বিশেষ চিহ্ন রহিল না; হয় ত বর্ত্তমান খর্ব্বকায় এস্কিমো জাতি অদ্যাপি তাহাদের বংশ রক্ষা করিতেছে। নবাগত মনুষ্যেরা কাল চোখ, কাল চুল ও লম্বা মাথা লইয়া দক্ষিণ ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল।

ইহারাও ধাতুর ব্যবহার প্রথমে জানিত না, পাথর কাটিয়া বিবিধ সুন্দর অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত। আর্য্য গ্রীক অথবা হেলীনেরা বোধ হয় ইহাদিগকেই জয় করিয়া ও দাসত্বে আনয়ন করিয়া গ্রীসের ইতিহাস আরম্ভ করেন।

ইহাদের পর আরও একটি অনার্য্যজাতি ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। সমস্ত মধ্য ইউরোপে ইহাদের অধিকার স্থাপিত হয়। ইহাদেরও কাল চুল ও কাল চোখ, অধিকন্তু ইহা-দের বদনমণ্ডল প্রকৃতই মণ্ডলাকৃতি। ক্রমশঃ অধিকার প্রসারিত করিয়া ইহারা সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের পূর্ব্বতন দীর্ঘানন অধিবাসীদিগকে আপনাদের সহিত মিশাইয়া ফেলে।

ইহাদের পর আর্য্যজাতির প্রবেশ। আর্য্যজাতির দৈহিক লক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জাতির অপেক্ষা উন্নত ছিল। ইহারা যেখানে উপস্থিত হইয়াছে, সেই-খানেই পূর্ব্বতন অধিবাসীকে পরাজিত করিয়া আপন ধর্ম্ম, আপন ভাষা আপন আচার অবলম্বন করিয়াছে। আর্য্যেতর ভাষার, আর্য্যেতর ধর্ম্মের প্রায় সর্ব্বত্র মূলোচ্ছেদ হইয়াছে; তবে অনার্য্যের দৈহিক গঠন একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। এই আর্য্যরাই হয়ত বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা সকলেই আর্য্য। পূর্ব্ব হইতে ইহারা ক্রমশঃ পশ্চিমগামী, উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণগামী হইয়াছে। উহা-দের ধর্ম্ম ও ভাষা বিজিত ভূখণ্ডে প্রবল হইয়াছে। প্রাচীন মানবগণের ভাষা ও ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি সেই অনার্য্য ভাষা হয় ত দুই এক জায়গায় লুকায়িত রহিয়াছে। পিরিনীস-পর্ব্বতপার্শ্বস্থ বাস্ক ভাষা সেই প্রাচীনকালের অনার্য্য জাতির ভাষা। বাস্কভাষী অনার্য্যগণ,

যাহারা আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তৃত ছিল, তাহাদিগকে আইবিরীয় নাম দেওয়া হয়। অনার্য্য ভাষা লোপ পাইয়াছে সত্য কিন্তু শারীরিক গঠন ধরিয়া বিচার করিলে দক্ষিণ ইউরোপের লোক আর্য্যধর্ম্মা হইলেও স্থূলতঃ অনার্য্যবংশজ। মধ্য ইউরোপের লোক বংশে সঙ্কর। উত্তরাঞ্চলের লোক স্থূলতঃ খাঁটি আর্য্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ধরিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। ব্রিটিশ দ্বীপে পূর্ব্বে অনার্য্যজাতির বাস ছিল। আর্য্য কেল্ট আসিয়া উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যায়। অনার্য্য আর্য্যের সহিত মিশে নাই। আর্য্যই অনার্য্যের সহিত মিশিয়াছিল। ভাষা ছিল পূর্ব্বে অনার্য্য বাস্কজাতীয়, ভাষা হইল আর্য্য কেল্টিক। পরে রোমানেরা এই আর্য্যভাষাভাষী অনার্য্যজাতিকে পরাস্ত করিয়া খ্রীষ্টীয় ও রোমান সভ্যতা প্রদান করে। তবে তাহারা ভাষায় বা শোণিতের অধিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে অবসর পায় নাই। পরে জর্ম্মানি হইতে প্রায় খাঁটি আর্য্য জর্ম্মান আসিয়া ব্রিটিশ দ্বীপ ক্রমে অধিকার করে ও পূর্ব্বতন অধিবাসীদের সহিত মিশে। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে কেল্টিক ভাষা সম্পূর্ণ লোপ পায়। পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে অদ্যাপি কেল্টিক ভাষা লোপ পায় নাই। পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসীতে আর্য্যত্বের মাত্রা অধিক, পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীতে অনার্য্যত্বের মাত্রা অধিক। স্পেন দেশে ও ফরাসী দেশে বাস্কভাষী অনার্য্য আইবিরীয়গণ বাস করিত। ফরাসী দেশের কতক অংশে আর্য্য অধিকার বিস্তারের সহিত কেল্টিক ভাষা ও রীতিনীতি চলিত হয়। রোমানেরা উভয় দেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া আর্য্য রোমক ভাষা প্রচলিত করে। শোণিত মূলতঃ অনার্য্যই রহিয়া যায়। পরে রোমসাম্রাজ্যের পতন ও জর্ম্মান বিপ্লবের সময়, ফরাসীর পূর্ব্বোত্তরভাগে

আর্য্যগণের প্রবল মাত্রায় আমদানি হয়। এক্ষণে স্পেনবাসী স্থূলতঃ অনার্য্যবংশীয় আর্য্যভাষী। দক্ষিণ ফরাসীর পক্ষেও তাহাই বক্তব্য। উত্তরপূর্ব্ব ফরাসীতে স্থূলতঃ আর্য্য কেল্ট ও আর্য্য টিউটনের অধিবাস; ভাষা সর্ব্বত্র আর্য্য রোমক।

প্রাচীন রোমানদের জাতিনির্ণয় দুরূহ। প্রাচীন রোমকেরা উত্তর হইতে আগত গলজাতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইত। তাৎকালিক গলদিগের যেরূপ বিবরণ আছে ও পরবর্ত্তী ইতিহাসে জর্ম্মানদিগের যে বিবরণ আছে, তাহাতে উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল বোধ হয় না। গল ও জর্ম্মান উভয়েরই প্রকাণ্ড কলেবর ও নীল চক্ষু রোমক ঐতিহাসিকের নিকট প্রশংসা অধিকার করিয়াছিল। এই গলেরা আবার পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিয়া এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গল ও জর্ম্মান উভয়েই প্রায় খাঁটি আর্য্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। রোমকেরা স্বয়ং বোধ করি সঙ্করজাতিভুক্ত ছিল। তাহারা আর্য্য ভাষায় কথা কহিত ও আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রাচীন অনার্য্য আইবিরীয় জাতি, বোধ হয়, আর্য্যগণের সহিত কিয়দংশে মিশ্রিত হইয়া ইটালির বিভিন্ন সঙ্করজাতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

গ্রীস দেশে মণ্ডলানন আইবিরীয় জাতির বোধ করি বিস্তার হয় নাই। সেখানে দীর্ঘাননশালী অনার্য্যেরই বসতি ছিল। আর্য্য হেলীনেরা আসিয়া ইহাদিগকেই জয় করে ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। প্রাচীন গ্রীসে সমাজের উচ্চতর স্তরে আর্য্যত্ব ও নিম্নতর স্তরে অনার্য্যত্ব প্রবল ছিল। পরবর্ত্তী কালে খ্রীষ্টানির বিস্তারের উভয়ে মিশিয়া গিয়াছে।

জর্ম্মানির দক্ষিণ ভাগে সঙ্করজাতিরই অধিক প্রাদুর্ভাব। উত্তর জর্ম্মানিতে ও স্কান্দিনেবিয়াতে বিশুদ্ধ আর্য্যের সংখ্যা বোধ হয় পৃথিবীর অন্যস্থান অপেক্ষা অধিক।

রুশিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের লোকে স্লাবনিক ভাষায় কথা কহে। স্লাবনিক ভাষা আর্য্যভাষার শাখা মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন ব্যক্তি স্লাবনিক ভাষায় কথা কহে, সেই আর্য্য-বংশধর, এমন নহে। এমন কি রুশিয়াতে যতটা বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে, ততটা অন্যত্র হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও ঠিক্ এই ইতিহাস। দক্ষিণাপথে অধিকাংশ লোকই আর্য্যধর্ম্মা, কিন্তু অনার্য্যভাষী ও অনার্য্যবংশীয়। আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দু-সমাজে উচ্চস্তরে আর্য্যত্বের ও নিম্নস্তরে অনার্য্যত্বের মাত্রা অধিক। ভারতবিজেতা আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া সমাজ-ভুক্ত করিয়াছিলেন। শূদ্রের সহিত তাঁহারা বৈবাহিক সম্বন্ধে সহজে মিশিতে চাহিতেন না। তথাপি মিশ্রণের নিবারণও অসাধ্য ছিল। দ্বিজাতির সংখ্যা পূর্ব্বেও অল্প ছিল, এখনও অল্প আছে। সেকালে দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রকন্যাবিবাহ বৈধ বিবাহের অন্তর্গত ছিল। ফলে, আমরা যতই আর্য্যত্বের স্পর্দ্ধা করি না, শুক্ল চর্ম্ম ও নীল চক্ষুর প্রাদুর্ভাব আমাদের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যেও অধিক দেখা যায় না। প্রশস্ত ললাট সুদীর্ঘ আয়তন ও উন্নত নাসা মাত্র দেখিয়াই আজকাল আমাদের মধ্যে আর্য্যত্বের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রখর সূর্য্যাতপ চর্ম্মের বর্ণবিকারের জন্য কতকটা দায়ী হইতে পারে, কিন্তু কতকটা মাত্র। বেদমার্গানুযায়ী হিন্দুশাস্ত্র কঠিন নিয়মের প্রয়োগ দ্বারা দ্বিজাতির বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধ বিপ্লব ও তৎপরবর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্কারকের মিলিত প্রয়াসে সেই বিশুদ্ধির যথেষ্ট অপচয় ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম নীচকে উচ্চে তুলিয়াছে স্বীকার করি; কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চকেও নীচে নামাইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

এই পুরাতন প্রাচীন আর্য্যজাতির আদিম নিবাস কোথায় ছিল, নিরূপণ দুষ্কর। অতি প্রাচীন কালে মধ্য এশিয়াব পশ্চিমভাগ বিশাল গভীর মহাসাগরতলে নিমগ্ন ছিল, ভূবিদ্যা এই কথার প্রমাণ দেয়। পশ্চিমে ইউরোপখণ্ড ও পূর্ব্বে এশিয়াখণ্ড, এই মহাসাগর কর্তৃক বিচ্ছিন্ন ছিল। মধ্য ইউরোপ ধৌত করিয়া সমুদয় জলরাশি বিশাল নদ নদীর আকারে এই মহাসাগরে পতিত হইত। ইরাণ ও হিন্দুকুশেব মালভূমি ধৌত করিয়া বড নদী উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া এহ মহাসাগরে পতিত হইত। এই মহাসাগর প্রকৃতই তাৎকালিক ভূমধ্যসাগব ছিল। বর্ত্তমান সাইবিরিয়া ও উত্তর ইউরোপের উত্তবাংশ তখন উত্তর মহাসাগরের গর্ভে মগ্ন ছিল। ঐ উত্তর মহাসাগবেব সহিত হয়ত সেই পুরাকালীন ভূমধ্যসাগরেরও সংযোগ ছিল। বোধ হয়, এই ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে প্রাচীন পীতকায় তাতার বা তুবাণ জাতি বসতি করিয়া পূর্ব্ব এশিয়াখণ্ডে আধিপত্য করিত। সেই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলে শ্বেতকায় আর্য্যগণ ধীরে ধীরে আপন গার্হস্থ সমাজ স্থাপন করিতেছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা পশ্চিমগামী হইয়া ইউবোপের পুবাতন অধিবাসীদিগকে দূরীকৃত করিতেছিলেন, বা স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মিশ্র সমাজ স্থাপন করিতেছিলেন।

কালক্রমে সেই ভূমধ্যসাগবের তলদেশ ভূগর্ভাগত শক্তির বলে উত্তোলিত হইতে থাকে। মহাসাগবের পবিধিসীমা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। উহার জলবাশি উত্তরমুখে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইয়া উত্তর মহাসাগবে মিশিতে থাকে। অদ্যাপি ওবিনদী সেই পথে সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত সাইবিরিয়ার প্রান্তর ভেদ করিয়া উত্তরমুখে বহিতেছে। সাগরগর্ভ ক্রমশঃ উত্তোলিত হইয়া মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। মহাসাগর ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় জল

এখনও শুকায় নাই। বৈকাল ও বালকাশ, আরাল, কাস্পীয় ও কৃষ্ণসাগর অদ্যাপি স্থানে স্থানে সেই প্রাচীন বিশাল মহাসাগরের পুরাতন অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বল্‌গা ও দানিউব, আমুদরিয়া ও শিরদরিয়া অদ্যাপি পূর্ব্বের মত পশ্চিম ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়া ধুইয়া সেই মহাসাগরের গর্ভদেশ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই মহাসাগরের গর্ভ উত্তোলিত হইয়া স্থলে পরিণত হইলে ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ সাধিত হয়। তখনই বোধ করি পশ্চিমবাসী আর্য্যগণের কেহ কেহ সেই স্থলপথে আসিয়া ইরাণের উত্তরে আসিবেশ নিয়ে আরাল ও কাস্পীয়সাগরের তটবর্ত্তী ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সেই স্থানে ইঁহাদের প্রাচ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচ্যধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। সেই সময়ে বা কিছুকাল পরে এশিয়াখণ্ডের অন্যান্য প্রাচীন জাতির সহিত তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে মানবজাতির ইতিহাসের আরম্ভ। এশিয়াদেশে তখন পুরাতন বিবিধ মানবসম্প্রদায় উন্নতির পন্থায় আরোহণের চেষ্টা করিতেছিল। পূর্ব্বে তাতারজাতি চীনসাম্রাজ্য ও চীনসভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের তটবর্ত্তী উর্ব্বর প্রদেশে কালদীয় জাতি আপন গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিল। দূরে নীল-নদতটে সূর্য্যপূজার প্রচারের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল আবিষ্কারের আরম্ভ হইতেছিল।

মধ্য এশিয়াতে জল যত শুকাইতে লাগিল, সমুদ্রগর্ভ উত্তোলিত হইয়া কোথাও অনুর্ব্বর প্রান্তর, কোথাও বা মালভূমি বা মরুভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল, অন্নার্থী পীতকায় উগ্রস্বভাব মোগলেরা ততই স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সরিতে লাগিল। বোধ হয়, তাহাদেরই পীড়নে আর্য্যগণ দক্ষিণবর্ত্তী হইয়া হিন্দুকুশের ও ইরাণের মালভূমি

আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়েন। প্রতাপান্বিত ব্যাবিলন ও নিনেবের ভূপতি-গণ বহুদিন ধরিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। পূর্ব্বমুখে খাইবার ও বোলানের গিরিসঙ্কট পার হইয়া কেহ কেহ সপ্তসিন্ধু-তীরে উপনীত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভারতভূমিতে তখন ক্ষুদ্র কায় কৃষ্ণবর্ণ কোলারীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতি বাস করিত। ইহারা ক্রমশঃ আর্য্যসমাজের গৃহীত হইয়া আর্য্যদের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড হিন্দু জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমে আর্য্য মীদিক ও পারসীক কিছু দিন পরে ব্যাবিলনের ধ্বংসসাধন করিয়া বিক্রান্ত পারসীক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইহার পব হইতে সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনা। আর কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় না। সুতরাং তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধেব বিষয় নহে।

ইতিহাসে লেখে, পারসীকদিগের সহিত উত্তরাঞ্চলবাসী সীদীয় বা শকজাতির সংঘর্ষ প্রায় উপস্থিত হইত। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা সীদীয় জাতির যেরূপ বিবরণ দেন, তাহাতে অন্ততঃ আকার-অবয়বে তাহারা আর্য্যজাতিরই অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। হইতে পারে তাহারা আর্য্য ও মোগল উভয়েব মিশ্রণে উৎপন্ন, অথবা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মোগল বা তাতাব জাতি। সম্প্রতি এই প্রশ্নের মীমাংসার উপায নাই। আর্য্যগণের ভারতবর্ষ আগমনের পর শকজাতি পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষে প্রবেশ কবে। প্রাচীন অযোধ্যবাসী শাক্যজাতির কুলপ্রদীপ কুমার সিদ্ধার্থের সহিত এই শকজাতির কোন সম্বন্ধ ছিল কি -না, বলা যায় না। উত্তরকালে শকজাতি বাহ্লীকের গ্রীকগণের স্থাপিত যবনরাজ্যের ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আপ-তিত হয়। মহারাজ কনিষ্কের সময় শকজাতির আধিপত্য মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শকজাতি আর্য্যবংশীয় ছিল কি না বলা

যায় না, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও ভারতবর্ষের সমাজে তাহাদের বাসচিহ্ন চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

মধ্য এশিয়া এখনও শুকাইতেছে! এখনও সময়ে সময়ে মধ্যএশিয়া হইতে উগ্রস্বভাব পীতবর্ণ অনার্য্য দলে দলে বাহির হইয়া মানবের সভ্যতা ধ্বংস করিবার জন্য বাহির হয়। পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে আতলান্তিক পর্য্যন্ত সমস্ত মহাদেশ তাহাদের ভয়ে চকিত ও সন্ত্রস্ত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হূনজাতি পশ্চিমমুখে ধাবিত হইয়া ইউরোপবাসী আর্য্যগণের মধ্যে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে, ও রোম-সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইউরোপের ইতিহাস নূতন করিয়া আবদ্ধ করে। ঠিক সেই সময়েই উহারা দক্ষিণে ও পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া পারস্য হইতে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশ কাঁপাইয়া তোলে। পরাক্রান্ত গুপ্তসাম্রাজ্য তাহাদের কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদের গতিরোধ করিয়া ভারতবর্ষে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যান।

আরও সাতশত বৎসর পৃথিবীর ইতিহাসে অতীত হইল। পুনশ্চ মধ্য এশিয়া পৃথিবীর উপপ্লবের জন্য বর্ব্বরপাল প্রেরণ করিল। রুম-সম্রাট্ ও দিল্লীর সম্রাট্ ও চীন-সম্রাট্ জঙ্গিস ও তৈমুরের নামে যুগপৎ কাঁপিতে লাগিলেন। আরও পাঁচশত বৎসর পরে দেখিতে পাই, রুমের সিংহাসনে তুর্কি বসিয়া রোমসাম্রাজ্যে আধিপত্য করিতেছে, ও চৌহান রাজপুতের সিংহাসনে মোগল বসিয়া হিন্দুর নিকট জিজিয়া আদায় করিতেছে।

হর্ম্মান হেলম্‌হোলৎজ
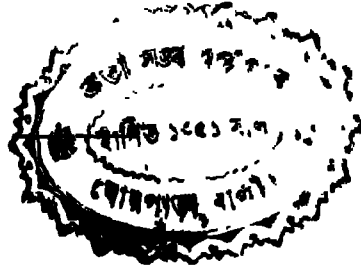
চারিমাসমাত্র হইল,*হেলম্‌হোলৎজের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন জানে যে, পৃথিবী হইতে একটা দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইয়াছে। হেলম্‌হোলৎজের জন্য শোক করিবার অবস্থা আমাদের এখনও হয় নাই; কখনও হইবে কি?

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ; কিন্তু হেলম্‌হোলৎজের মত লোক ধরাধামে কয়টা জন্মিয়াছে? হেলম্‌হোলৎজ জন্মিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনুষ্য যতটুকু অমরতার দাওয়া করিতে পারে, তাহা তাঁহার প্রাপ্য।

ছোটখাট পাহাড় পর্ব্বত যথেষ্ট সংখ্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া ধরাতলের বন্ধুরতা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু গৌরবে ও মহিমায় ধবলগিরি অধিক স্থানে স্পর্দ্ধিত হয় না। হেলম্‌হোলৎজ নরসমাজে এইরূপ একটা ধবলগিরি ছিলেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে যদি অবতারের আবশ্যকতা স্বীকার করা যায়, এবং জ্ঞানের বিস্তার যদি ধর্ম্মসংস্থাপনের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে হেলম্‌হোলৎজ নরসমাজে 'অবতীর্ণ' হইয়াছিলেন।

হেলম্‌হোলৎজ জ্ঞানের পরিধি কতদূর প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ বিবৃত করিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধা করি না। সৌভাগ্যক্রমে লণ্ডন রয়াল সোসাইটির গত অধিবেশনে স্বয়ং লর্ড কেলবিন এবিষয়ে আপনার অক্ষমতা স্বীকার করিয়া, সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান অন্যান্য প্রাণীকে তজ্জন্য লজ্জার দায়ে অব্যাহতি দিয়াছেন। মহাজনের নাম কীর্ত্তনে যদি কিছু পুণ্য থাকে, কিঞ্চিন্মাত্রায় সেই সুলভ পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়াসে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জর্ম্মানির পতসদাম নগরে ১৮২১ সালে হেলমহোলৎজের জন্ম হয়।

---

* ১৮৯৪ অব্দে পঠিত

১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভবিষ্যতে যিনি মানবের বিজ্ঞানেতিহাস লিপিবদ্ধ করিবেন, এই তেয়াত্তর বৎসর বিস্মৃত হইলে তাঁহার চলিবে না।

আমাদের দেশের বালকগণের প্রবল বমনোদ্রেক সত্ত্বেও, ইংরাজি ব্যাকরণ, ইংরাজি ভূগোল, ইংরাজি ইতিহাস, কিছুমাত্র দন্তস্ফুট করিবার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেও, গলাধঃকরণ করিবার সনাতন নিয়ম প্রচলিত আছে. আমহু প্রচলিত নিয়মচক্রের নেমি ভারতবর্ষেও ক্ষুণ্ণ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে; এমন কি জগৎচক্রের নিয়মগ্রন্থিও দুই একটা শিথিল হইবার সম্ভব, কিন্তু আমাদের পাঠশালামধ্যে এই প্রাচীন নিয়মগুলির রেখামাত্র ব্যভিচারের কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে একটা ভরসা, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরাজি সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত, ইউরোপেও গ্রীকলাতীনের অধ্যাপনাসম্বন্ধে অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদের ক্ষোভের কারণ নাই; যেহেতু 'মহাজনো যেন গতঃ' ইত্যাদি।

যাহা হউক, সনাতন নিয়মানুসারে হেলম্‌হোলৎজকেও ক্লাসে বসিয়া গ্রীকলাতীন গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। শুনা যায়, প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষরেই কৃষ্ণনামস্মরণে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং যণ্ডামার্কের প্রচণ্ড শাসনও সরস্বতীর নিকট তাঁহার মাথা নোয়াইতে সমর্থ হয় নাই। হেলম্‌হোলৎজের সম্বন্ধে সেরূপ কোনও নিন্দাবাদ প্রচলিত নাই; তবে তিনি যে ক্লাসে বসিয়া ক্লাসিকের মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়া জ্যামিতির আঁক করিতেন, তাহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এই নীতিবিরুদ্ধ অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য কখনও তাঁহাকে মাষ্টারের বেত্রাঘাত লাভ করিতে হইয়াছিল কি না, জানি না। জানিলে, অন্ততঃ আমরা কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতাম।

পাঠাবস্থায় পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁহার একটু অনুরাগ ও ঝোঁক

ছিল; এমন কি, জ্যামিতি ও বীজগণিতের অপেক্ষাও তিনি জড় ও জড়ের গুণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসিতেন। সাংসারিক অবস্থার অনুরোধে পিতার আদেশে তাঁহাকে ডাক্তারী শিখিতে হয়। "ফ্রেডরিক উইলিয়ম ইনষ্টিটিউটে" ডাক্তারী শিখিয়া সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। ডাক্তারি ব্যবসায় সেই মহার্ঘ জীবনের অপব্যয় হয় নাই। ডাক্তারি হইতে জীববিদ্যা, তাহা হইতে পদার্থবিদ্যা, তাহা হইতে গণিতবিদ্যা, তাহা হইতে মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, এইরূপে ক্রমে মনুষ্যজাতি জ্ঞানমহার্ণবের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কি পরাক্রম!

ডাক্তারি ছাড়িয়া তাঁহাকে নানাস্থানে অধ্যাপকতা করিতে হইয়াছিল। প্রথমে সহকারিত্ব, পরে অধ্যাপকতা। তিনি কনিগস্‌বর্গ, হিদেলবর্গ, বন, এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার অধ্যাপনা করিয়া, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭১ সাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন।

আর সম্মানের কথা! রাজগোষ্ঠী, পণ্ডিতসমাজ ও জনসমাজ, দেশী ও বিদেশী যাঁর যতদূর সাধ্য, তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এরূপস্থলে সম্মান প্রদর্শনের অর্থ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ও ঋণশোধের চেষ্টা, কিন্তু এ ঋণ কি শোধিবার?

শরীরবিদ্যাবিষয়ে হেলম্‌হোলৎজ জোহান মূলরের ছাত্র ছিলেন। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য; কাহাকে দেখিবে বল? আমাদিগকে দৃষ্টিমাত্রেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের স্বদেশে গুরুও নাই, শিষ্যও নাই; এখানে কাহাকে দেখিব? হায় আমাদের অদৃষ্ট! চিরদিনই কি আমাদের এমনি ছিল! এমন দিন কি আসিবে না যে, শিষ্যের মত গুরু ও গুরুর মত শিষ্য এই ভারতবর্ষেও আবার দেখা যাইবে?

গুরুর প্রবর্ত্তনায় হেলম্‌হোলৎজ অজ্ঞানে তামস রাজ্যে দিগ্বিজয়ার্থ প্রবেশে সাহসী হয়েন। সে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা; তার পর সেই তামস রাজ্যের কতটা তাঁহারই অধ্যবসায়ে আলোকিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানাইব?

সেই সময়ে হেলম্‌হোলৎজ টাইফস জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহা দ্বারা তিনি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করেন। আজ কাল শিক্ষার্থীর ঘরে ঘরে অণুবীক্ষণ রহিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে জর্ম্মাণিতেও তাহা ছিল না। অণুবীক্ষণ অনেকের ঘরে দেখা যায় বটে, কিন্তু হেলম্‌হোলৎজ তাহার মধ্যে কয় জন?

যাহা হউক, সেই অণুবীক্ষণ ক্রয়ের পর তাঁহার হাতে যে দুই একটা প্রকাণ্ড কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বাকটিরিয়ার নাম আজ লোকের মুখে মুখে,—বিশেষ সম্প্রতি কলিকাতা সহরে ওলাওঠা ও বসন্তের এই প্রকোপকালে। সম্প্রতি কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক বসন্তের টীকা লইল, বাকি অর্দ্ধেক হয় ত দুই দিন পরে ওলাওটার টীকা লইবে। যেরূপ হাওয়ার গতি দেখিতেছি, তাহাতে কিছুদিন পরে কুক্কুরদংশনেও টীকা লইতে হইবে, ইহা বোধ করি বিধাতার বিধান,—ভবিতব্য। বস্তুতঃ শ্বাপদসমাকুলা অরণ্যানী আর মানুষের ভয়বিধায়িনী নহে; শয্যাতলে লুকায়িতা কালভুজঙ্গিনীও আর যমদূতী নহে, এখন স্থূলদৃষ্টির অগোচর কমা-বাসিলাস অথবা দাড়ি-ভিব্রিও কখন কোন অলক্ষিতে দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অকস্মাৎ অন্তরাত্মাকে তাহার প্রিয়তম আধার হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কাতেই অন্তরাত্মা এক রকম পূর্ব্ব হইতেই ওষ্ঠপ্রান্তে অবস্থিত থাকেন। প্রকৃতই আজ কাল শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তম্

জীবিতব্য কিরূপে, ভাবিবার দরকার নাই, জীবন যে এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য।

জীববিজ্ঞাঘটিত এই নূতন তত্ত্বের সহিত মহাত্মা পাস্তুরের নাম চিরকালের জন্য গ্রথিত রহিয়াছে; কিন্তু সকলে হয় ত জানেন না যে এই নূতন মন্ত্রের হেলম্‌হোলৎজই পুরাতন ঋষি।

জৈব পদার্থ কিরূপে পচিয়া যায়, ইহা একটা রসায়নশাস্ত্রের সমস্যা। পচিবার সময় জৈব পদার্থের অঙ্গারভাগ বায়ুস্থিত অম্লজানের সহযোগে ধীরে ধীরে পুড়িয়া যায়, ইহা অবশ্য রাসায়নিকগণের পুরাতন আবিষ্কার। কিন্তু কতগুলি ক্ষুদ্র ও প্রায় অতীন্দ্রিয় জীবাণু যে এই অবকাশে অপ্রতিহতভাবে আপনাদের শরীরপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি সাধিত করিয়া লয়, এই গুপ্ত বার্ত্তাটুকু কিছুদিন পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। আজকাল অবশ্য টিণ্ডাল প্রভৃতির প্রসাদে এইরূপ দুই চারিটা কথার সংবাদ রাখা বড়ই সুকর হইয়াছে; এবং যে জানে না, সে কতকটা ত্রেতাযুগের জীব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু হেলম্‌হোলৎজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নূতন ক্রীত অণুবীক্ষণ সাহায্যে পচনশীল দ্রব্যে এই জীবাণুর অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। শুধু অস্তিত্বের আবিষ্কার নহে; এই জীবাণুর অবস্থিতিই যে পচনক্রিয়ার একমাত্র কারণ, যেখানে জীবাণুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ, সেখানে জৈব পদার্থ সহস্র বৎসর অম্লজানের স্পর্শে রক্ষিত হইলেও পচিবে না, শর্করায় মাদকত্বের উৎপত্তি ঠিক্ এই পচনক্রিয়ারই অনুরূপ, ইহাতেও জীবাণু বিশেষের অবস্থিতি আবশ্যক, এ সমুদয়ই হেলম্‌হোলৎজ সপ্রমাণ করেন। একটা আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা ছিল—হয়ত সেই সেই জীবাণুর শরীর হইতে এরূপ কোনও রস বা বিষ নিঃসৃত হয়, যাহা শুদ্ধ রাসায়নিক ক্রিয়াবলে জৈব পদার্থকে বিকৃত করে ও শর্করাকে সুরায় পরিণত করিয়া থাকে। হেলমহোলৎজ শর্করা জীবাণুর মাঝে

একখানি সূক্ষ্ম পরদা রাখিয়া দেখাইলেন যে, পরদাখানি নিঃসৃত রসের সঞ্চার রোধ করিতে পারে না, জীবাণুগণেরই সঞ্চার রোধ করে মাত্র। কিন্তু এরূপ স্থলে চিনিরও মদ্যে পরিণতি ঘটে না। সিদ্ধান্ত হইল, এই ব্যাপারটা জৈব প্রক্রিয়া ; রাসায়নিক প্রক্রিয়া নহে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলে না জানিতে পারেন, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখও অসম্ভব। পাস্তুরের মহিমান্বিত আবিষ্ক্রিয়াপরম্পরার ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া হেলম্‌হোলৎজের নাম উল্লেখ না করিলে চলিবে না।

জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়, নির্জ্জীব জড় হইতে কখনও জীব জন্মিতে দেখা যায় নাই, এই তথ্যের আবিষ্কার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতেই আসিয়াছে। যাঁহারা বানর হইতে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে মনে আনিতেও একটা নৈতিক মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাহাদের অনেকে অবলীলাক্রমে নির্জ্জীব জড় পদার্থ হইতে অকস্মাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শরীরী জীবের উদ্ভব স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। স্বেদ, মল, আবর্জ্জনা হইতে বিধাতার মরজিতে বড় বড় কীটের বা পতঙ্গের উৎপত্তি আপনা হইতে হয়, ইহাতে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরও ধ্রুব বিশ্বাস, তবে শুধু আমাদের দেশেই নহে।

শরীরবিদ্যায়, স্নায়ুযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াসম্বন্ধে হেলমহোলৎজ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা ও উদ্ভাবনশক্তি কিরূপে জটিল সমস্যার তথ্যোচ্ছেদে সমর্থ হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জীবদেহে স্নায়ুসূত্রগুলি টেলিগ্রাফের তারের সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। তাহারা বাহিরের খবর ভিতরে পৌঁছাইয়া দেয় ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনে। সংবাদবহন তাহাদের কাজ। তাড়িতশক্তি

যেমন কয়েকটি সঙ্কেত আশ্রয় করিয়া এক প্রান্তের বার্ত্তা অন্য প্রান্তে উপস্থিত করে, ইহারাও সেইরূপ সঙ্কেতের আশ্রয় করিয়া বাহিরের বার্ত্তা ভিতরে প্রেরণ করে ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনয়ন করে। মস্তিষ্ক অর্থাৎ হেড আফিস কতকগুলি সঙ্কেত পাইয়া তাহার অর্থ আবিষ্কার করিতে ব্যাপৃত থাকে ও অর্থ আবিষ্কারের পর তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করে।

স্নায়ুসূত্রের কার্য্য সংবাদপ্রেরণ, তবে এই সংবাদপ্রেরণে সময় আবশ্যক হয় কি না? তাড়িত-প্রবাহযোগে বার্ত্তাপ্রেরণেও কিছু না কিছু সময় দরকার; আলোকেরও সুদূরস্থ নক্ষত্র হইতে পৃথিবী পৌঁছিতে সময় দরকার হয়। স্নায়ুসূত্রের ভিতরে এই স্রোত কি বেগে প্রবাহিত হয়? হেলম্‌হোলৎজ প্রথমে দেখান, এই স্রোতের বেগ সেকণ্ডে ষাটি হাত মাত্র; তাড়িতপ্রবাহ বা আলোকতরঙ্গের তুলনায় নগণ্য। অর্থাৎ কি না একটা ষাটি হাত লম্বা তিমি মাছের লেজে বল্লমের খোচা বিঁধিলে মস্তিষ্কে তাহার খবর পৌঁছিতে অন্ততঃ এক সেকেণ্ড সময় লাগিবে, অথবা এক সেকেণ্ড পর সে বুঝিবে যে, এত বড় একটা প্রাণঘাতক ব্যাপার উপস্থিত। আবার, আঘাতের পরে মস্তিষ্ক হইতে আদেশ আসিয়া তাহার লেজ সরাইয়া লইতে অন্ততঃ আর এক সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হইবে।

শুনা যায়, ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্ক হইতে কর্ণ দুই ক্রোশ তফাতে অবস্থিত ছিল। হে ত্রৈবাশিকজ্ঞ মানব, বল দেখি, কপিরাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক উক্ত রক্ষঃপ্রবীরের কর্ণচ্ছেদন ব্যাপার সংঘটনের কতক্ষণ পরে তিনি টের পান?

বলিতে গেলে আধুনিক শব্দবিজ্ঞান হেলম্‌হোলৎজেরই গঠিত, তাঁহারই "হাতে মানুষকরা" ছেলে। হেলম্‌হোলৎজের পূর্ব্বে শব্দবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞান সম্বন্ধে গোটা কতক মোটা কথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল মাত্র। তিনিই সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। কিরূপে একটি বিশুদ্ধ স্বরের

সহকারে তাহার উর্দ্ধতন-গ্রামবর্ত্তী স্বরাবলী সমবেত ও জড়িত হইয়া ঐ মূল স্বরটিকে বিবিধ নাদে ধ্বনিত করে, কখন সুরের সহিত সুরের মিল ঘটিয়া প্রীতি জন্মে, কখন মিলের অভাবে প্রীতির ব্যাঘাত হয়, নরকণ্ঠ-নিঃসৃত বিবিধ স্বরকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কি কি মৌলিক সুর বাহির করা যায়, কিরূপে যন্ত্রোদ্গত কতিপয় মৌলিক সুরকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন নরকণ্ঠাগত স্বরে উৎপাদন করিতে পারা যায়, ইত্যাদি নানা কথা এবং এই সকল শব্দব্যাপারের সময়ে শব্দসঞ্চালক বায়ুমধ্যে ও শব্দোৎপাদক কঠিন দ্রব্যের কিরূপ আণবিক গতি সংঘটিত হয়, হেলম্‌হোলৎজের শব্দবিজ্ঞানসংক্রান্ত মহাগ্রন্থ প্রচারের পূর্ব্বে এ সমুদয়ই আঁধারে ছিল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংগঠনপ্রণালী, এবং কিরূপ বায়ুসঞ্চারী উর্ম্মিগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন্ অঙ্গে কিরূপে প্রতিহত হইয়া কিরূপে কাণ্ড ঘটাইয়া দেয়; এ সমুদয় কাণ্ডের সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বে ছিল না। স্বরবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞানের সহকারে যে যে মনোবিজ্ঞানঘটিত গভীর সমস্যা আপনা হইতে উপস্থিত হয়, হেলমহোলৎজের পূর্ব্বে কে তাহার মীমাংসায় সাহসী হইত?

শব্দবিজ্ঞানের পর দৃষ্টিবিজ্ঞান। হেলম্‌হোলৎজের আবিষ্কৃত দৃষ্টি-বিজ্ঞানঘটিত তথ্যগুলির মাহাত্ম্যের উপলব্ধি করাই কঠিন। তাঁহার আবিষ্কৃত চক্ষুরীক্ষণ (ophthalmoscope) যন্ত্রের উল্লেখ বোধ করি অনাবশ্যক। চক্ষুর অভ্যন্তর পরীক্ষার জন্য আজকাল এই যন্ত্র ডাক্তারদের একমাত্র অবলম্বন।

দৃষ্টিসম্বন্ধে অনেক রহস্য যাহা সর্ব্বদা আমাদের জ্ঞানের ভিতর আইসে না, তাহা হেলম্‌হোলৎজ প্রথমে দেখাইয়া দেন। রেটিনা নামক স্নায়বিক পরদার গঠনে কি কি নানাবিধ সাধারণ ও অসাধারণ দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, দূরদৃষ্টির ও নিকটদৃষ্টির সময়ে কিরূপে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশ ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়, কিরূপে বিভিন্ন পদার্থের দূরত্বের উপলব্ধি

হয়, কিরূপে দ্রব্যমাত্রকে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, তিনগুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ জন্মে; বর্ণের উজ্জ্বলতায় কিরূপে ছোট জিনিষকে বড় দেখায়; কিরূপে তিনটিমাত্র মূল বর্ণের বোধ স্বীকার করিয়া লইলে সেই তিনটি মৌলিক অনুভূতিরই বিবিধবিধানে সংমিশ্রণদ্বারা অসংখ্য বিচিত্র বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি বুঝান যাইতে পারে; কিরূপে ইহারই মধ্যে একটি মৌলিক বোধের অভাব ঘটিলে মানুষে রঙ্কাণা হইয়া যায়; দৃষ্টিগোচর দ্রব্যমাত্রেরই কোন্ অংশটা বস্তুতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, আর কোন্ অংশটাই বা মানসগোচর মাত্র, অর্থাৎ একটা বস্তুর কতটা আমরা বাস্তবিকই দেখিতে পাই, আর কতটাই বা মনে মনে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া লই; ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে হেলম্‌হোলৎজ যে সকল রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহার নামোল্লেখমাত্র দ্বারা বিবরণ দেওয়াই অসম্ভব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। কিন্তু জ্ঞান কিরূপে বাহির হইতে এই দ্বারপথে প্রবেশ লাভ করে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের পবিচয় এ পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত ছিল। বাহিরে জড়প্রকৃতিতে নানাবিধ আনাগোনা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিতেছে, ইন্দ্রিয়গণ সেই সকলের বার্ত্তা কোনও মতে মস্তিষ্কের হেড আফিসে পৌছাইয়া দেয়, এবং আমাদের অন্তঃকরণ সেই সঙ্কেতগুলি বাছিয়া গোছাইয়া সাজাইয়া নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ গঠন প্রস্তুত করে, কতক সুন্দর বোধে ও আবশ্যক বোধে গ্রহণ ও কতক অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করিয়া জীবনের স্থিতি, গতি, পুষ্টি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানে নিরত থাকে। বাহিরে কিরূপ আনাগোনা আন্দোলন চলিতেছে, ইহা জড়বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার বিষয়; ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে এই সকল আন্দোলনের বার্ত্তা মস্তিষ্কে হাজির করে, ইহা জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার বিষয়; এবং অন্তঃকরণ সেই বার্ত্তাগুলি বা সঙ্কেতগুলিকে

কিরূপে গোছাইয়া ও সাজাইয়া সেই উপাদানসকলে বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিতে বসে, তাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। স্থূলতঃ এই তিন ছাড়িয়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই। পণ্ডিতগণের মধ্যে এক এক ব্যক্তি ইহার একটিমাত্র অথবা একটিরই কোন সঙ্কীর্ণ অংশমাত্র লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। জ্ঞানসাম্রাজ্যের তিন মহাদেশে একই সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারেন, হেলম্‌হোলৎজ এইরূপ কৃতকর্ম্ম পুরুষ ছিলেন, বোধ করি এ বিষয়ে তিনি তাৎকালিক মনুষ্যমধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।

শ্রুতি ও দৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, সূক্ষ্মতায় অথবা প্রভাবে অন্য ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সমকক্ষ নহে। প্রধানতঃ শ্রুতি ও দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া আমরা এই বিচিত্র সুন্দর জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছি। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ইহাদের সাহায্য করে মাত্র। এই দুই ইন্দ্রিয়, ইহাদের গঠন, ইহাদের বিষয়, ও ইহাদের ক্রিয়া, এ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা অপর কেহ করে নাই।

জড়গতের সহিত আমাদের অন্তর্জ্জগতের এমনি কি সম্বন্ধ আছে যে, কতকগুলি জিনিষকে আমরা সুন্দর দেখি, কতকগুলিকে কুৎসিত দেখি? আমাদের এই সৌন্দর্য্যবোধের মূলক কি? এই সৌন্দর্য্যবোধ কোথা হইতে আইসে? এই গভীর তত্ত্বের মীমাংসার জন্য মানব বহুদিন হইতে লালায়িত। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মীমাংসা একা হেলমহোলৎজ হইতে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, অন্য কোন ব্যক্তি হইতে তাহা হয় নাই। হেলমহোলৎজই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। জড়ের সহিত মনের কি সম্বন্ধ, এই গভীর সমস্যার মীমাংসার জন্য মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। যে পথে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে, হেলম্‌হোলৎজই তাহা দেখাইয়াছেন।

১৮৪৭ সালে ভৌতিক শক্তির অনশ্বরতা সম্বন্ধে হেলম্‌হোলৎজের বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। তাহার পর পদার্থবিদ্যা রূপান্তর পরিগ্রহ

করিয়াছে। একটা সুকৌশল যন্ত্র বানাইয়া দিলে উহা বিনাশ্রমে বিনা ব্যয়ে চিরদিন ধরিয়া চলিতে পারিবে ও কাজ দিবে, সে কালের লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এখনও যে এই বিশ্বাসের ধারা অন্তঃসলিল-প্রবাহের ন্যায় বহিতেছে না, এমন নহে। জড়ের সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এই তত্ত্ব কিছুদিন পূর্ব্বে রসায়ন বিজ্ঞানের জন্মদাতা লাবোয়াশিয়ে কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল; কিন্তু শক্তির ও যে সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এ তত্ত্ব তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, সৎ অসতে পরিণত হয় না, এইরূপ একটা বাক্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ ছিল না, এবং এই স্বতঃসিদ্ধ হইতে কি সিদ্ধান্ত হয় বা না হয়, তাহারও কেহ ধ্রুব নির্দ্দেশে সাহস করিতেন না। শক্তির বহুরূপিতা হেলম্‌হোলৎজের কিছু দিন পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু শক্তির অনশ্বরতাকে একটা বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রতিপাদনের কার্য্য, হেলম্‌হোলৎজেরই প্রতিভার অপেক্ষায় ছিল।

এক হিসাবে মনুষ্যশরীরকে যন্ত্রহিসাবে দেখা যায়। তবে সে কালে অন্য যন্ত্রের সহিত দেহযন্ত্রের কোনরূপ তুলনা সম্ভবিত না। বাষ্পযন্ত্রে কয়লা পোড়াইতে হয়, ঘটিকাযন্ত্রে মাঝে মাঝে দম দিতে হয়, কিন্তু দেহযন্ত্রে জীবনরূপ একটা কি-জানি-কি অতিপ্রাকৃত শক্তি বিনাব্যয়ে, বিনাশ্রমে কার্য্য চালাইতেছে, এইরূপ একটা বিশ্বাস সকলেরই ছিল। হেলমহোলৎজের লিখিত উক্ত প্রবন্ধপ্রকাশের পর হইতে কথা উঠিয়াছে যে জীবন হয় ত একটা কবিজনোচিত কল্পনামাত্র, একটা আভিধানিক শব্দমাত্র, কতকগুলি ক্রিয়াসমষ্টির অভিধানমাত্র কয়লা না পোড়াইলে যেমন বাষ্পযন্ত্র চলে না, কয়লা না পোড়াইলে সেইরূপ দেহযন্ত্রেরও চলিবার সম্ভাবনা নাই, এবং এই উভয়ই কয়লাই আমাদের সেই চির-পরিচিত কৃষ্ণকায় অঙ্গার।

আমাদের সৌরজগৎ আর একটা প্রকাণ্ডতর যন্ত্র। সূর্য্যমণ্ডল হইতে রাশি রাশি শক্তি বাহির হইয়া তাপরূপে ও আলোকরূপে দিগ্‌ দিগন্তে আকীর্ণ হইতেছে ও তাহারই কণিকামাত্র পাইয়া গ্রহে উপগ্রহে নানাবিধ ভৌতিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই পৃথিবীতে যে বায়ু বহে, জল পড়ে, মেঘ ডাকে, বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত জন্মে ও মরে, হাসে ও কাঁদে, খেলা করে ও নাচিয়া বেড়ায়, সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমাগত কণিকাপ্রমাণ শক্তিই এই সমুদয়ের কারণ। কিন্তু এই অপরিমেয় শক্তি আসিল কোথা হইতে? হেলম্‌হোলৎজ দেখাইয়াছিলেন যে সূর্য্যমণ্ডলে এই শক্তির ভাণ্ডার, অনন্ত নহে, ইহারও পরিমাণ আছে ও ক্ষয় আছে। কোথা হইতে এই ভাণ্ডার সংগৃহীত হইল, এবং এই ব্যয়েরই বা পরিমাণকি, হেলম্‌হোলৎজ তাহারও হিসাব দিলেন। বলাবাহুল্য সেই হিসাব সর্ব্বত্র গৃহীত-হইয়াছে। সৌরজগৎরূপ মহাযন্ত্র কিরূপে কত দিন হইতে চলিতেছে, তাহা গণিবার উপায় হেলম্‌হোলৎজের নিকটেই মানবজাতি শিখিয়াছে।

গণিতশাস্ত্রে হেলম্‌হোলৎজ কি করিয়াছেন, কিরূপে বুঝাইব? দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গসাহিত্য, অন্য দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই।

মহামতি লর্ড কেলবিনের বিখ্যাত vortex theoryর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। জগদ্ব্যাপী আকাশে বা ঈথরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তের নাম জড়পরমাণু। হেলম্‌হোলৎজের প্রতিভা এই পরমাণুতত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়াছিল। ঘর্ষণক্ষমতা-বর্জ্জিত তরলপদার্থের আবর্ত্তোৎপাদন গণিবার যে প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, বেলাভূমিতে উর্ম্মিরেখার বায়ুমধ্যে মেঘের উৎপত্তি হইতে আকাশমধ্যে জড়পরমাণুর উৎপত্তি পর্য্যন্ত বুঝাইতে সেই প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে।

হেলম্‌হোলৎজ অনেক নূতন গড়িয়াছেন, আবার অনেক পুরাতন

ভাঙিয়াছেন। ইউক্লিডের সময় হইতে মানবজাতি আজ পর্য্যন্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ লইয়া জ্যামিতিবিদ্যা অথবা দেশতত্ত্ব গঠন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। আজ কাল সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির মূল ভিত্তি লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। কে বলিল, আমাদের দেশের (অর্থাৎ আকাশের) সীমা নাই? কে বলিল, আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই সমাকার? দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে তাহারাও পরস্পর সমান, কে বলিল, ইহা অখণ্ডনীয় স্বতঃসিদ্ধ? মনুষ্যজাতি আবহমান কাল হইতে কতকগুলি বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। মানুষের মতে ইহারা সত্য, ইহারা স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের সংস্কার যে, ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া না ধরিলে জীবনযাত্রা যেন চলিবে না, যেন জগৎপ্রণালী উল্টাইয়া যাইবে, যেন জগদ্‌যন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইবে। বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট এইরূপ অধিকাংশ সত্যের স্বতঃসিদ্ধতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যাহা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিগত সত্য বলিয়া মানিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই সুবিধার জন্য মনুষ্যকর্তৃক সৃষ্ট বা কল্পিত; মানুষেরই হাতগড়া পুত্তলী। কিন্তু জ্যামিতিবিদ্যার মূল সত্যগুলির স্বতঃসিদ্ধতায় সন্দেহ করিতে ইমানুয়েল কাণ্টও সাহসী হয়েন নাই। হেলম্‌হোলৎজ জ্যামিতিস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনি প্রথমে দেখান, মনুষ্যের মনের বাহিরে সত্যও কিছুই নাই, স্বতঃসিদ্ধও কিছুই নাই। বিষয়টি বড় গুরুতর, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইল।

অধ্যাপক মক্ষমূলর

ভারতবাসীর নিকট অধ্যাপক মক্ষমূলরের নাম যতটা পরিচিত বোধ করি আর কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের নাম ততটা পরিচিত ছিল না। তাঁহার অপেক্ষাও কৃতকর্ম্মা প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিদেশে জন্মিয়াছেন এবং এখনও হয় ত বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু ভারতবাসীর সহিত তাঁহাদের তেমন পরিচয় নাই; শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের নাম শুনিয়াছেন, অনেকে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় মুগ্ধ থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মক্ষমূলরের নাম শুনিয়াছেন, এমন উদাহরণ বিরল নহে।

মক্ষমূলরের জীবনচরিত আমাদের সাময়িক পত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে; সেই জীবনচরিত পুনরায় কীর্ত্তনের সম্প্রতি আবশ্যকতা দেখি না।

কিন্তু মক্ষমূলরের পাণ্ডিত্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আমাদের সহিত তাঁহার এমন একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, যে সূত্রে তিনি আমাদের মধ্যে একটা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

মক্ষমূলর সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার জন্যই আমাদের দেশে বিখ্যাত, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি বিবিধ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্ত্তমানকালের ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তাঁহাকে গণ্য করিলে ভুল হইবে না। সুবিখ্যাত সার উইলিয়াম জোন্স যেদিন সংস্কৃতসাহিত্য নামে একটা অতি প্রাচীন সাহিত্য আছে, এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, সেই দিনই বর্ত্তমান কালে ভাষাবিজ্ঞানের জন্মদিন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তৎপূর্ব্বে ইউরোপের পণ্ডিতেরা যেমন

যাবতীয় মানবকে ইহুদী জাতি-বর্ণিত আদি মানব আদমের সন্তান বলিয়া স্থির করিতেন, সেইরূপ সভ্যজাতির কথিত ভাষাসমূহকে ইহুদীজাতির ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য পাশ্চাত্যদেশে আবিষ্কৃত হওয়ার পর সহসা প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, ইহুদী ভাষার সহিত বিবিধ ইউরোপীয় ভাষার কোন সম্পর্ক নাই, এবং ইহুদীজাতির সহিত ইউরোপীয় জাতিসমূহের কোনরূপ নিকট শোণিতসম্পর্কও নাই। বরঞ্চ সংস্কৃত ভাষার সহিত ঐ সকল ভাষার অত্যন্ত সম্পর্ক রহিয়াছে; এবং সংস্কৃতভাষী ভারতবাসীর সহিত পাশ্চাত্য জাতিগণের শোণিতসম্পর্কও রহিয়াছে। মক্ষমূলরের পূর্ব্বেই এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে এই নূতন ভাষাতত্ত্ব ও এই নূতন জাতিতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর হইতেই তিনি এই নূতন ভাষাতত্ত্ব ও নূতন জাতিতত্ত্বের তথ্যানুসন্ধানে ও সাধারণের সমক্ষে প্রচারে আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আর্য্যভাষাসমূহের সম্বন্ধ নিরূপণে ও আর্য্যজাতিগণের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছে একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইংরাজের ভাষার সহিত আমাদের ভাষার সম্পর্ক আছে, সুতরাং ইংরাজের সহিত আমাদের শোণিতগত সম্পর্ক আছে, আমরা উভয়েই আর্য্যবংশধর, এই মোটা কথাটা আজকাল সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত আছেন যাঁহারা ইংরাজদিগকে আর্য্যনাম প্রদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন, এবং বিশুদ্ধ আর্য্যনামটা কেবল আমাদের নিজস্ব মনে করিয়া আনন্দ বোধ করিবেন। তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আমার ইচ্ছা নাই, তবে আমরা যে আর্য্যবংশধর

সে কথা আমরা বহুশত বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এবং আমরা যে সেই অতি পুরাতন সত্যটা পুনরায় জানিতে পারিয়াছি ও আমাদের আর্য্যত্বের জন্য স্থানে অস্থানে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছি, তজ্জন্য আমরা আর্য্য মক্ষমূলরের নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রচার মক্ষমূলরের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, এবং ঋগ্বেদসংহিতার মাহাত্ম্য তিনিই পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করেন। ঋগ্বেদসংহিতাকে তিনি আর্য্যজাতির প্রাচীনতম ও মানবজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং ঋগ্বেদসংহিতার কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি আর্য্যজাতির ভারতবর্ষপ্রবেশের কালনির্ণয়েরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের সাহায্যেই তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রাক্‌কালীন পুরাতন আর্য্যসমাজের অবস্থানির্ণয়েও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইরূপে মানবজাতির অতীত ইতিহাসের একটা বিস্মৃত পরিচ্ছেদ তিনি নূতন করিয়া আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তৎকৃত কাল-নির্ণয় এবং তদুদ্‌ঘাটিত ইতিহাস সকলে হয়ত নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না, জ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে এই ইতিহাস হয়ত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও মক্ষমূলর যে অসাধারণ পরিশ্রম, চিন্তাশীলতা ও অধ্যবসায়ের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সযত্নে লিপিবদ্ধ হইবে।

আমাদের মধ্যে এক অতি বিজ্ঞ সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা বৈজ্ঞানিকগণের পুনঃপুনঃ মত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিজ্ঞানকে উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের এইখানেই প্রভেদ। বিজ্ঞান দিন দিন আপনাকে সংশোধিত ও উন্নত করিয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞানের মূর্ত্তি চিরকালই একরূপ। তথায় কোনরূপ বিকারের সম্ভাবনা নাই। আলোকেরই নীল ও পীত ও হরিৎ এবং

উজ্জ্বল ও তীব্র ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণ আছে, কিন্তু অন্ধকার চিরদিনই আঁধার, তাহার অন্য বিশেষণ নাই।

অধ্যাপক মক্ষমূলর কর্তৃক প্রচারিত ঐতিহাসিক তথ্যসকলে ভ্রম বাহির হইতে পারে, এবং তৎকৃত বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যার কালচক্রে ভ্রান্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু এ কথা সকলেরই জানা উচিত, যে ব্যক্তি কাজ করে তাহারই ভ্রান্তি ঘটে, যে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়, তাহার ভ্রান্তির আবিষ্কার বিধাতারও অসাধ্য।

মক্ষমূলের প্রতিভা কেবল ভাষাতত্ত্বেই আবদ্ধ ছিল না; ভাষাতত্ত্বের পরিধি ছাড়াইয়া অন্যান্য শাখাতেও তিনি যে সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে সময়ে সময়ে তুমুল আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে। ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বিদ্যমান, এই হিসাবে ভাষাগত বিজ্ঞান অর্থাৎ philology মানব-বিজ্ঞানের বা anthropologyর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, পূর্বে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু মানবের মধ্যে শোণিতসম্পর্কের নির্ণয় প্রকৃতপক্ষে জীব-তত্ত্বের বিষয়। তোমার সহিত আমার শোণিত সম্বন্ধ আছে কিনা, উভয়ের কথিত ভাষা ধরিয়া বিচার করিতে গেলে অনেক সময় এ বিষয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু উভয়ের শরীরগত সাদৃশ্য, উভয়ের গায়ের রঙ, মাথার চুল হাতের গঠন, চোখের চাহনি প্রভৃতি ধরিয়া বিচার করিতে গেলে সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিছুদিন পূর্বে মক্ষমূলর-প্রমুখ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল ভাষাগত সাদৃশ্য ধরিয়া বিবিধ মানবজাতির শোণিতসম্পর্ক নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাদের এই আবদার সহ্য করিতে পারিতেছেন না, এবং তাঁহাদিগকে স্বকীয় গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতে উপদেশ দিয়া শরীরতত্ত্বের সাহায্যে মানবগণের জাতিনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সমালোচনায় ভাষাতাত্ত্বিকগণের সিদ্ধান্ত বহুস্থলে

সংসোধন-সাপেক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং কালে আরও সংশোধনের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষা-বিজ্ঞানের মীমাংসা একবারে উল্‌টাইয়া যাইবে এরূপও বোধ হয় না।

আমাদের বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও তৎসহ গ্রীক্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির প্রাচীন শাস্ত্রের তুলনা করিয়া অধ্যাপক মক্ষমূলর একটা অভিনব দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের স্থাপনায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অতি প্রাচীনকালে পুরাতন আর্য্যজাতি যখন মধ্য-এশিয়ায় বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালী ও উপাসনা-প্রণালী ছিল। আর্য্যগণের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হইলে সেই প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালীই ক্রমশঃ প্রাদেশিক বিকার ও পরিবর্ত্তন সহকারে বিবিধ আর্য্যধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল, কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুজাতির দেবদেবীগণের সহিত প্রাচীন গ্রীক্ ও জার্ম্মাণ জাতির দেবদেবীগণের পুরাতন সম্বন্ধ নির্ণয় অসাধ্য নহে, আর্য্যজাতির প্রাচীন দেবতাগণের সম্বন্ধে বিবিধ উপাখ্যান কিরূপে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বিবিধ জাতির পৌরাণিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশও সম্পূর্ণ অসাধ্য নহে। আর্য্যজাতির দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া মক্ষমূলর বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিবৃত্ত নির্ণয়ে প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, এবং বিজ্ঞানের অন্য যে কোন শাখার আলোচনাতেই তিনি হাত দিতেন, তিনি তাহাতে ভাষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। রঙিন চশমা চোখে দিলে যেমন জগৎশুদ্ধই রঙিন দেখায়, তিনি সেইরূপ ভাষাবিজ্ঞানের রঙিন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে জগতের দিকে চাহিতেন। কাজেই অন্যান্য বিজ্ঞানে তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই; তাঁহার প্রণীত ও ধর্ম্মতত্ত্বও পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে নির্ব্বিবাদে গৃহীত হয় নাই। ইংরাজগণের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সর, এড্‌ওয়ার্ড টাইলর,

এণ্ড্ল্যাং প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অন্যবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের বিরোধী মতের সহিত মক্ষমূলরের মতের বিসংবাদ প্রায়ই ঘটিত। ধর্ম্মতত্ত্বের ভবিষ্যৎ কি তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু মক্ষমূলরের প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বতোমুখিনী ছিল, তাহা দেখাইবার পক্ষে ইহা একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

মনুষ্যের ভাষার সহিত মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—আমাদের চিন্তা ক্রিয়াটাই ভাষা সাপেক্ষ বটে কি না, তাহা লইয়া বিতণ্ডা চলিতে পারে। অন্ততঃ ভাষার সাহায্য না পাইলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ হইত, তাহা গভীর আলোচনার বিষয় বটে। মক্ষমূলর মনো-বিজ্ঞানের এই দুরূহ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহার সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, বা করিবে, তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উপস্থিত করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

যাহাই হউক, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এবং বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক সমাজে মক্ষমূলরের স্থান অতি উচ্চে ছিল,—কত উচ্চে ছিল, তাহার নির্দ্ধারণে সম্প্রতি প্রয়োজন নাই এবং সম্ভবতঃ সম্প্রতি তাহার নির্দ্ধা-রণের সময়ও উপস্থিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস প্রণয়নে তাঁহার কৃতিত্বও ভবিষ্যৎ সমালোচনার বিষয়।

প্রাচ্যবিদ্যায় মক্ষমূলরের পাণ্ডিত্য অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা অন্যান্য পণ্ডিতের নাই, এবং যাহার গুণে তিনি ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পাইবার অধিকারী ছিলেন।

এই বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের প্রতি ও ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ। তিনি ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে মনের সহিত ভাল-বাসিতেন; বলা বাহুল্য যে পণ্ডিতমাত্রেই—প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমাত্রেই সেরূপ ভালবাসেন না। ভারতবাসীর প্রতি এই

আন্তরিক অনুরাগ তাঁহার নানা কার্য্যে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ষের সাহিত্য লইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়া অনেক বড় বড় পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছিলেন ও উৎকট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু what India can teach us, ভারতবর্ষ ইউরোপকে কি শিক্ষা দিতে পারে, এই বিষয়ের আলোচনায় অন্য কাহারও লেখনী এত ব্যাকুল হয় নাই। অধম ভারতবাসীর জীবন চরিত লিখিয়া সময় ব্যয় করা বোধ হয় তৎশ্রেণীর আর কোন পণ্ডিত কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন নাই। মক্ষমূলরের সহিত যে সকল আধুনিক কৃতী ভারতসন্তানের পরিচয় ছিল, অথবা পরিচয় না থাকিলেও যাঁহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে ও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা ফেলিবার কথা নহে। ভারতবর্ষের হিতচিন্তায় তাঁহার জীবৎকালের অনেকটা অংশের ব্যয় হইয়াছে। ছোট ছোট কাজেও তাঁহার এই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের কারাবাস কালে স্বপ্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতা তাঁহাকে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া তিনি এই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কাজটা ছোট, কিন্তু এইরূপ ছোট কাজেই আত্মীয় চেনা যায়, বিশেষতঃ বন্ধুবর্গের আত্মীয়তার সারতা আপন্নিকষপাষাণেই ধরা পড়ে। গল্প শোনা যায় যে, মক্ষমূলর ভারতবর্ষের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াও ভারতভূমিতে পদার্পণে সাহসী হন নাই, তাঁহার আশঙ্কা ছিল, মনঃকল্পিত ভারতবর্ষের যে আদর্শ বহুদিন হইতে তাঁহার মনের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, ভারতবর্ষ চোখের সম্মুখে আসিলে কোথায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এত মিষ্ট কথা আমরা বড় শুনিতে পাই না। ভারতবর্ষের লোকেও তাঁহার অনুরাগ অনুভব না করিত, এমন নহে। বিলাত প্রবাসী ভারতবাসীর অনেকেই মক্ষমূলরের সহিত আলাপ করিয়া আসা একটা কর্ত্তব্য মধ্যে বিবেচনা করিতেন; এই আলাপসূত্রে অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক

তরুণবয়স্ক ছাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শরণাপন্ন হইত। একবার শুনিয়াছিলাম, কলিকাতার কোন ধনিসন্তান পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অধ্যাপক-বিদায় স্বরূপে মক্ষমূলরকে এক জোড়া শাল উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এদেশের অনেক পণ্ডিতলোকে তাঁহাদের গ্রন্থের জন্য মক্ষমূলরের প্রশংসাপত্র না পাইলে যেন তৃপ্তিবোধ করিতেন না। এদেশের অনেকের সহিতই তাঁহার চিঠিপত্র চলিত। ফলকথা, মক্ষমূলর আমাদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন; আমরা সেই বন্ধু হারাইয়াছি। পণ্ডিতপ্রসূ পাশ্চাত্যভূমিতে আরও কত বড বড় পণ্ডিত জন্মিবেন। কিন্তু আর একজন মক্ষমূলরকে আমরা কবে পাইব, কে বলিতে পারে?

শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্যে মানুষের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার কোথায় কি আছে সন্ধান করিয়া দেখেন, এবং সেই অনুসন্ধানে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু সেই শবদেহের প্রতি তাঁহাদের যে বিশেষ একটা অনুরাগ জন্মে, তাহা বলা বলা যায় না। আপনার কাজটা সারিয়া ফেলিয়'ই তাঁহারা বিবিধ 'ডিস্‌ইনফেক্টণ্ট' প্রয়োগে আপনার শরীরের অশুদ্ধি ও ছুরিকার অশুদ্ধি ও টেবিলের অশুদ্ধি তাড়াতাড়ি শোধনের জন্য ব্যস্ত হয়েন। দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু জাতির প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকের কার্য্যকে কতকটা এইরূপ শবব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এই মৃতজাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কাব করিয়া যথেষ্ট আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিকর হয়, তাহা বলিতে পারি না। আচার্য্য মক্ষমূলর কিন্তু ইহাকে ঠিক্ শবদেহ বলিয়া ভাবিতেন না; অন্ততঃ এই দেহের ধমনীগুলির মধ্যে এককালে রক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত হইত, এবং ইহার

হৃৎপিণ্ড এক কালে প্রাণের শক্তিযোগে স্পন্দিত হইত, ইহা তিনি বুঝিতেন; এবং বাক্যের দ্বারা এবং কার্য্যের দ্বারা তাঁহার সেই মনোভাবের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আমরা সেই স্বর্গগত আর্য্যদের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের জন্মাবধি যাঁহারা ইহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, সাহিত্যপরিষৎ স্থাপনের সময় উপদেশ যাচ্ঞা করিয়া মক্ষমূলরকে পত্র লেখা হইয়াছিল। মক্ষমূলর সেই পত্রের উত্তরে নবীন পরিষৎকে কয়েকটী ছোটখাট উপদেশ দিয়াছিলেন। একটা উপদেশ এইরূপ। বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক গ্রামের ও প্রত্যেক নদনদী বিলখাল প্রভৃতির নাম সংগ্রহ করিয়া সেই সেই নামের উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা পরিষদের একটা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে কাজটা অতি ছোট; এবং আমাদের পরিষৎ এ পর্য্যন্ত এত ছোট কাজে হস্তার্পণ করিয়া আপনার মহত্ত্বকে সঙ্কুচিত করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু পরিষদের জানা উচিত ছিল, যে ছোট বীজ হইতে বড় গাছ হয়; এবং ছোট কাজের মাহাত্ম্য যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বড় কাজের সম্পাদনে সমর্থ হয়েন। রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস লেখক যদি কেহ না থাকিত, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের গ্রামগুলির ও নগরগুলির নামতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেই দেশে রোমের প্রভুত্বের কথা আবিষ্কৃত হইতে পারিত। সেইরূপ এই ছোট কাজে বাঙ্গালাদেশের বিস্মৃত অতীত ইতিহাসের কোন্ অংশ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না পারে, তাহা আমরা কিরূপে বলিব? মক্ষমূলর স্বয়ং ছোট কাজকে অবজ্ঞা করিতেন না। কোথায় দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে না, মক্ষমূলর বিভিন্ন ভাষায় বিড়ালের নামের ইতিবৃত্ত অতি গম্ভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। প্রাচীন গ্রীসের ও প্রাচীন ইউরোপের প্রাচীনতম সাহিত্যে নাকি বিড়ালের কোন উল্লেখ নাই। আমাদের সংস্কৃত প্রাচীন

সাহিত্যেও অনেক জন্তুর নাম আছে, বিড়ালের নাকি নাম নাই। বৈদূর্য্য-নামক, রত্ন ইংরাজিতে যাহাকে cat's eye বলে, উহাকে বিড়ালশব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বৈদূর্য্য রত্নেরও নাকি অতি প্রাচীন সাহিত্যে নাম নাই। কাজেই অনুমান হইতে পারে যে প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে এবং আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা যে সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল সেই সকল দেশে, বিড়াল ছিল না। তার বহুদিন পরে কোন সময়ে আলুর মত ও তামাকের মত কোন্ অনার্য্য বিদেশ হইতে বিড়াল আসিয়া আর্য্যদেশমধ্যে ও আর্য্যগৃহ মধ্যে ও আর্য্যসাহিত্য-মধ্যে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। সেই বিদেশী বিড়ালজাতির স্বর্গাদপি গরীয়সী আদি মাতৃভূমি কোন্ দেশ? সম্ভবতঃ উহা মিশরদেশ, মিশরদেশে অতি প্রাচীনকালে বিড়াল-দেবতা পূজা পাইতেন, এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন মিশরদেশে, ব্যাঘ্রজাতীয় কোন অরণ্যজন্তু গ্রাম্যতাপাদিত হইয়া বিড়াল রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে কালক্রমে মিশর হইতে বিড়ালের আধিপত্য অন্যান্য স্থলে বিস্তৃত হয়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবতত্ত্ববিদেরা ভাষাতত্ত্বের নিকট আর একটা ঋণ গ্রহণ করিবেন। মক্ষমূলরের অনুমান সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা বিচার করিবার এই স্থান নহে; আমি কেবল একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চাহি যে বড় লোকে ছোট কাজকে অবজ্ঞা করেন না, তাঁহাদের যত্নে ছোট বীজ হইতে বড় গাছ উৎপাদিত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মকালে ভারতবাসীর হিতৈষী জর্ম্মণ-দেশোদ্ভব আর্য্য মক্ষমূলর নবীন পরিষৎকে ক্ষুদ্রকার্য্যে অবজ্ঞা না করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি সেই পরলোকগত মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্র কার্য্যের মাহাত্ম্য বুঝিয়া চলিতে পারি তাহা হইলে সেই মহাত্মার উপদেশ ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশার্থ আহূত অদ্যকার এই সভা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

সৌরজগতের উৎপত্তি

রাত্রিকালে আমরা যে সকল জ্যোতির্ম্ময় তারকা দেখিতে পাই, তাহারা এক একটি সূর্য্য। আমাদের সূর্য্যও একটি ক্ষুদ্র তারকামাত্র; অনেক তারকা ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর। সহজ দৃষ্টিতে আমরা ছয় হাজারের অধিক তারা দেখিতে পাই না; কিন্তু দূরবীক্ষণগোচর তারার সংখ্যা কয়েক কোটি। দূরবীক্ষণেরও অগোচর কত তারা জগতে রহিয়াছে, কে বলিতে পারে?

এই জগৎ অতি বিশাল। আমাদের সূর্য্যটির আয়তন পৃথিবীর বারলক্ষ গুণ। পৃথিবী হইতে এই সূর্য্যের দূরত্ব নয়কোটি বিশলক্ষ মাইল। যে কয়টি তারার দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারা হইতে আলোক আসিতে সওয়া চারি বৎসর অতীত হয়; আলোকের বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পরস্পর এইরূপ কিংবা ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যবধানে রহিয়া কত কোটি তারকা অবস্থিত আছে; মনে কর এই জগৎ কত বড়! দূরবীক্ষণগোচর সুদূরপ্রদেশের অনেক তারকা হইতে আলোক আসিতে বহুশত বৎসর অতিক্রম হইতে পারে।

এই অসংখ্যেয় তারকার মধ্যে আমাদের তারকাকে অর্থাৎ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনস, নেপচুন

এই আটটি বড় বড় গ্রহ, এবং বহুশত ছোট ছোট গ্রহ স্ব স্ব পথে নির্দ্দিষ্ট বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আবার বৃহত্তর গ্রহকতিপয়ের পার্শ্বে কতক-গুলি উপগ্রহ নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণশীল। এই গ্রহ উপগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জে বেষ্টিত সূর্য্যকে লইয়া জগতের যে অংশ, তাহারই নাম সৌরজগৎ। সূর্য্য ইহার কেন্দ্রস্থ। বৃহস্পতি সকল গ্রহের বড ; নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থ, সূর্য্য হইতে নেপচুনের ব্যবধান পৃথিবীর ব্যবধানের ত্রিশ গুণ।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়মমতে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু সমুদয়ই নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে ; তাহাদের গতি সর্ব্বতোভাবে এই নিয়মের অনুযায়ী। কিন্তু সৌরজগতের গঠনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, যথা—

(১) গ্রহগুলি আকাশমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নহে ; উহাদের সকলেরই পথ প্রায় এক সমতলের উপর অবস্থিত ; এবং সেই সমতল সূর্য্যের নিরক্ষবৃত্তের সহিত প্রায় একতলে রহিয়াছে। কেবল ছোট গ্রহগুলির পথ সেই সমতল হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে দূরবর্ত্তী।

(২) সূর্য্য নিজের অক্ষোপরি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে আবর্ত্তন করে ; আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল গ্রহই ঠিক্ সেই মুখেই আপন পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে।

(৩) আবার গ্রহদিগের অক্ষোপরি আবর্ত্তনেরও সেই মুখ অর্থাৎ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। কেবল উরেনস ও নেপচুন এই নিয়মের বহির্ভূত।

(৪) গ্রহের ন্যায় উপগ্রহগুলিও প্রায় সেই সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত, তাহাদেরও গতির মুখ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। কেবল উরেনসের উপগ্রহ-গণ সেই তলে চলে না।

(৫) সূর্য্য হইতে গ্রহদের দূরত্ব মনে রাখিবার একটি সহজ সঙ্কেত আছে।

*	৩	৬	১২	২৪	৪৮	৯৬	১৯২

প্রত্যেকে ৪ যোগ কর ;

৪	৭	১০	১৬	২৮	৫২	১০০	১৯৬
বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	—	বৃহস্পতি	শনি	উরেনস।

বুধের দূরত্ব যদি ৪ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে পরে পরে লিখিত অঙ্ক পরে পরে লিখিত গ্রহের দূরত্ব-পরিমাপক হইবে। অঙ্কের নীচে কোন গ্রহের নাম নাই, কেপলার অনুমান করিয়াছিলেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কোন অনাবিষ্কৃত গ্রহ থাকিবে। কেপলারের বহুদিন পরে যখন উরেনস আবিষ্কৃত হইল এবং তাহার দূরত্বও উক্ত সঙ্কেতের অনুসারে দেখা গেল, তখন পণ্ডিতেরা কেপলারের অনুমিত গ্রহের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, সেই অনুসন্ধানের ফলে ২৮ পরিমিত স্থানে এক বৃহৎ গ্রহের পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক ছোট ছোট গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে একটি বড় গ্রহ ছিল, তাহা কোনরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়া এই খণ্ড গ্রহগুলিতে পরিণত হইয়াছে।

সৌরজগতের গঠনের এই বিশিষ্ট ভাব আলোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে, এই জগতের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ থাকিবে। এই সম্বন্ধ তাহাদের সৃষ্টিকাল বা জন্মকাল হইতেই রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধ কি? এই বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? গ্রহ-উপগ্রহাদি যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত না হইয়া, যদৃচ্ছমুখে না চলিয়া, এরূপ সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত কেন?

সৌরপরিবারের জ্যোতিষ্কদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এবং

পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলি তত্ত্বের সাহায্যে দেখিতে গেলে এই প্রশ্নের একটি উত্তর মনে উদিত হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় তপ্ত। ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া যতই নীচে যাওয়া যায়, ততই তাপাধিক্য অনুভূত হয়। তদ্ব্যতীত ভূকম্প, অগ্নিগিরি, উষ্ণপ্রস্রবণ, পর্ব্বতাদির উন্নয়ন, ভূখণ্ডবিশেষের ক্রমিক উত্থান ইত্যাদির একমাত্র সম্ভবপর কারণ,—ভূগর্ভস্থ তাপ। উত্তপ্ত পদার্থমাত্রই তাপ বিকিরণ করে ও কালক্রমে শীতল হয়, শীতল হইলে তাহার আয়তনও কমিয়া যায়। সুতরাং বহুপূর্ব্বে ভূমণ্ডল আরও উত্তপ্ত ছিল, এমন কি তরল অবস্থায় ছিল। তাহারও পূর্ব্বে যখন উত্তাপ আরও অধিক ছিল, তখন পৃথিবী বাষ্পময় ছিল, সন্দেহ নাই। তখন ইহার আয়তন যে আরও অধিক বেশী ছিল, সহজেই বুঝা যায়।

সূর্য্যও অবিরত তাপ বিকিরণ করিতেছে। একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে পারিলে যে পরিমাণ তাপ জন্মে, সূর্য্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে প্রতি ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বিকীর্ণ তাপের ২২৭, ০০, ০০, ০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাতেই পৃথিবীতে এত কার্য্য চলিতেছে। মনে কর, সমস্ত তাপের পরিমাণ কত।

সূর্য্যের এই তাপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? কেহ বলেন, সূর্য্যোপরি দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে; কেহ বলেন, অজস্রধারায় উল্কাপিণ্ড সূর্য্যোপরি দৃষ্ট হইতেছে, তাহার আঘাতেই এত তাপ। হেলম্‌হোলৎজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কি রাসায়নিক ক্রিয়া, কি উল্কাপতন, কিছুতেই এত তাপ জন্মাইতে পারে না। কেবল একমাত্র উপায় আছে; সূর্য্যের দেহসঙ্কোচে এই তাপরাশির উৎপত্তি হইতে পারে। সূর্য্যের দেহ যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, ততই

তাপোদ্গম হইতেছে। হেলম্‌হোলৎজের গণনায়, সূর্য্যের ব্যাস ৮৫ মাইল মাত্র কমিলে যে তাপ জন্মে, তাহাতে ২২৯০ বৎসর তাপ বিকিরণ চলিতে পারে। ঐ পণ্ডিত অনুমান করেন, সূর্য্য আদিকালে সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া ছিল; তাহা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং সেই সঙ্কোচনেই তাহার তেজ এতকাল উৎপন্ন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এতদ্ভিন্ন এত তেজোরাশির উৎপত্তির আর কোন সম্ভবপর কারণ থাকিতে পারে না।

এই সকল বিচার করিয়া সৌরজগতের অভিব্যক্তি নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে।

বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিৎ পণ্ডিত লাপ্লাস সৌরজগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। জর্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্টও ঐরূপ মতের পক্ষপাতী ছিলেন।

আদিতে সূর্য্যমণ্ডল সৌবজগতের সীমান্তপর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে ব্যাপ্ত ছিল। সেই বাষ্পরাশির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইত। কালক্রমে সেই বিভিন্নমুখ গতি একীভূত হওয়াতে সেই বাষ্পরাশির ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে এক মহতী আবর্ত্তগতি উৎপন্ন হইল। তাপবিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ বলে সেই বিশাল পিণ্ড সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। পিণ্ডের আয়তনহ্রাসের সহিত তাহার আবর্ত্তনবেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেগবৃদ্ধির সহিত কেন্দ্রাপসারণ প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি হওয়ায় সেই দ্রব জড়পিণ্ডের নিরক্ষদেশ স্ফীত হইল ও মেরুপ্রদেশ চাপিয়া গেল। ক্রমিক সঙ্কোচনে কেন্দ্রাপসারণ চেষ্টা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় স্ফীত নিরক্ষদেশ-মধ্যবর্ত্তী তরল পিণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি অঙ্গুরীর আকার ধারণ করিল। এখন দেখিতে পাই যে, অভ্যন্তরে একটি পিণ্ড নিজ অক্ষোপরি পশ্চিম হইতে

পূর্ব্বমুখে আবর্ত্তন করিতেছে, এবং ক্রমেই ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হইতেছে; এবং একটি বিশাল চক্রাকার অঙ্গুরী তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইতে না পারিয়া তাহাকেই বেষ্টন করিয়া সেই মুখেই ঘুরিতেছে। কালক্রমে পিণ্ডটি আরও সঙ্কুচিত হইল, আরও প্রবৃদ্ধবেগ হইল এবং আর একটি ক্ষুদ্রতর অঙ্গুরীর সৃষ্টি করিল। এইরূপে নয়টি অঙ্গুরী এ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইয়াছে; এবং মধ্যস্থ তরলপিণ্ড ঘনীভূত ও শীর্ণকায় হইয়া আজিও প্রবলবেগে নিজ অক্ষোপরি আবর্ত্তন করিতেছে এবং আজিও শরীরেব সঙ্কোচন দ্বারা তাপ জন্মাইয়া দিগন্তে বিকিরণ করিতেছে।

এই এক একটি অঙ্গুরীই এক এক গ্রহ সৃষ্টির মূল। সেই অঙ্গুরী চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারে না; বিভিন্নাংশে বিভিন্নপরিমাণ সান্দ্রতা থাকায় ও বিভিন্ন বলের অধীন হওয়ায় ছোট বড় সহস্র খণ্ডে উহা বিভক্ত হইয়া যায় এবং খণ্ডগুলি বিভিন্নবেগে একই পথে চলিতে থাকে। পরে কালক্রমে এই খণ্ডসহস্র পরস্পর আকর্ষণে একত্র সম্মিলিত হইয়া একটি পিণ্ডের আকার ধারণ করে; পূর্ব্বে যাহা অঙ্গুরী ছিল, তাহাই আবার বর্ত্তুলাকার হইয়া সেই বিশাল আদিম মধ্যবর্ত্তী পিণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। এই ক্ষুদ্র বর্ত্তুলটিই একটি গ্রহ।

আবার সেই বৃহৎ পিণ্ড যে কারণে ঘনীভূত হইয়া নিজ শরীর হইতে গ্রহের সৃষ্টি করিল, ক্ষুদ্রতর পিণ্ড অর্থাৎ গ্রহও সেই কারণেই ক্রমে শীতল ও ঘনীভূত হইয়া নিজ অবয়ব হইতে ক্ষুদ্রতর অঙ্গুরী সৃষ্টি করে এবং সেই অঙ্গুরী আবার পিণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রতর উপগ্রহের সৃষ্টি করে। এইরূপে পৃথিবীর এক এবং মঙ্গলাদি গ্রহের একাধিক চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী তারল্য ত্যাগ করিয়া কঠিন হইয়াছে; এখন ইহার আর অঙ্গুরীজননের সম্ভাবনা নাই; তথাপি আবর্ত্তনজাত

কেন্দ্রাপসারণ চেষ্টার প্রভাবে ভূমণ্ডলের নিরক্ষদেশ আজিও স্ফীত রহিয়াছে এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ "কিঞ্চিৎ চাপা" হইয়াছে। শনিগ্রহের অঙ্গুরী আজিও বর্ত্তমান এবং তাহাতে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন নিয়তই লক্ষিত হইতেছে।

কেবলমাত্র যুক্তির উপর বৈজ্ঞানিক নির্ভর করেন না; গণিতের সিদ্ধান্তগুলিও পরীক্ষার দ্বারা চোখের উপর দেখিতে চাহেন। ফরাসী পণ্ডিত প্লাতো তৈলের তরল পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহা কৌশলক্রমে ঘুরাইয়া তাহা হইতে তৈলের সূর্য্য ও তৈলের গ্রহ উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিশাল সৌরজগতের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র তৈলজগৎ তাঁহার পরীক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছিল।

কতিপয় ঘটনা এই তত্ত্বের বিরোধী, অনেকে সে সকলের মীমাংসারও প্রয়াস পাইয়াছেন; তবে সর্ব্বত্র সঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায় নাই।

সকল গ্রহই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে চলে। আবার অক্ষের উপর আবর্ত্তনও প্রায় সকলেরই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে। 'প্রায়' বলা গেল, কেননা উরেনস ও নেপচুনের পক্ষে সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ ইহাদের আবর্ত্তনব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণ সহজ নহে। আবার গ্রহগণের নিরক্ষবৃত্ত উহাদের স্ব স্ব ভ্রমণপথ হইতে অধিক হেলিয়া নাই। ভ্রমণপথ ও নিরক্ষবৃত্তের অন্তর্গত কোণ পৃথিবীর পক্ষে ২৩৷৷০ অংশমাত্র, মঙ্গলের ২৫ অংশ, শনির প্রায় ২৭ অংশ, বৃহস্পতির ৩ অংশমাত্র, কিন্তু উরেনসের পক্ষে প্রায় ৬০ অংশ। গ্রহের পার্শ্বে যে সকল উপগ্রহ আছে, তাহারাও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ভ্রমণ করে। উরেনসের উপগ্রহেরা বিপরীত মুখে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরে। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, উরেনসের এবং সম্ভবতঃ নেপচুনের উৎপত্তিকালে এমন কোন

কারণ বর্ত্তমান ছিল, যাহা পরবর্ত্তী গ্রহগণের উৎপত্তির সময় উপস্থিত হয় নাই।

সূর্য্য হইতে যতই দূরে যাওয়া যায়,স্থূলতঃ গ্রহের আয়তন ততই বড় হয়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল অপেক্ষা বৃহস্পতি শনি, উরেনস ও নেপচুন অনেক বড়। ইহাই সম্ভব। কেননা বুধাদি গ্রহ ছোট ছোট অঙ্গুরী ও বৃহস্পতি বড় বড় অঙ্গুরী হইতে উৎপন্ন। কিন্তু এই নিয়মটা কেবল স্থূল হিসাবেই খাটে। সূক্ষ্ম হইলে বৃহস্পতির অপেক্ষা শনি, উরেনস ও নেপচুন ছোট হইত না।

বৃহস্পতি ও মঙ্গলেব মধ্যে একটি বড় গ্রহের পরিবর্ত্তে বহু শত ক্ষুদ্র গ্রহের অস্তিত্ব দেখা যায়। আপাততঃ মনে হয় যেন অঙ্গুরীটা শতধা বিছিন্ন হইয়া এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহেব উৎপত্তি করিয়াছে; যেন কোন কারণে এই খণ্ডগুলি জমাট বাঁধিতে পায় নাই। মহাকায় বৃহস্পতির সান্নিধ্য ইহাব কারণ কি না বলা যায় না। বৃহস্পতি ওজনে তিনশত পৃথিবী সমান। একটা গ্রহ ভাঙ্গিয়া এরূপ বহু শত গ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে কিনা, এবিষয়ে গণিতবিৎ পণ্ডিতেরা সংশয় করেন। সে যাহাই হউক, এই সকল ছোটগ্রহের মধ্যে বৃহত্তমের ব্যাস প্রায় তিনশত মাইল মাত্র; অনেকের ব্যাস কুড়ি মাইলেরও কম।

বড় গ্রহের উপগ্রহসংখ্যা ছোট গ্রহের উপগ্রহসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। বাস্তবিক মঙ্গলের উপগ্রহ দুইটি; তৃতীয় উপগ্রহও বোধ করি আছে; বুধ ও শুক্র উপগ্রহহীন, পৃথিবীর একটীমাত্র উপগ্রহ, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাকায় গ্রহের উপগ্রহসংখ্যা বহু

অধুনাতন পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে চারিদিক হইতে নূতন

প্রমাণ আসিয়া সৌরজগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এই মতের যেন সমর্থন করিতেছে।

আদিতে পৃথিবী ও সূর্য্য এক ছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা হইলে পৃথিবী ও সূর্য্য একই পদার্থে নির্ম্মিত হইবার কথা। এতদিন এই প্রশ্নের উত্তর কল্পনারও অগোচর ছিল, অধুনা আলোকবিশ্লেষণ দ্বারা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সূর্য্যমণ্ডলেও লৌহ, তাম্র, সোডিয়ম, উদ্‌জান প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

ছোট গ্রহ সর্ব্বাগ্রেই শীতল ও কঠিন হওয়া উচিত, বড় গ্রহের তদবস্থা পাইতে বিলম্ব হওয়া উচিত। গ্রহদের প্রকৃত অবস্থা দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, ইহা একেবারে কঠিন হইয়াছে; জল ও বায়ুর লেশমাত্র ইহাতে নাই; যদি থাকে, তবে কঠিন অবস্থায় আছে। .ইহার প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরিসমূহ বহুদিন অগ্ন্যুদ্গম ত্যাগ করিয়া নির্জ্জীব হইয়াছে, সুতরাং ইহার অভ্যন্তরও শীতল। আবার পৃথিবী চন্দ্রের পঞ্চাশগুণ বড। ইহাব অভ্যন্তর আজিও অগ্নিময়; পৃষ্ঠভাগ শীতল বটে, কিন্তু অদ্যাপি পৃথিবীর কিয়দংশ (বায়ুমণ্ডল) বাষ্পীয়, কিয়দংশ (মহাসাগর) তরল আকারে বর্ত্তমান। পৃথিবীর জীবন শেষ হইতে এখনও অনেক দিন রহিয়াছে। শুক্র ও মঙ্গল বয়সে ও আয়তনে অনেকাংশে পৃথিবীর অনুরূপ; তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থাও অনেকাংশে পৃথিবীর সদৃশ। মঙ্গল বায়ুরাশিতে বেষ্টিত; ইহাব পৃষ্ঠভাগ মহাদেশ ও মহাসাগরে বিভক্ত, ইহার মেরুপ্রদেশ তুষাররাশিতে সমাচ্ছন্ন, গ্রীষ্মাগমে তুষাররাশি গলিতে থাকে, আবার শীত আসিলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শনি ও বৃহস্পতি যেমন প্রকাণ্ডকায়, ইহাদের অবস্থাও তদনুরূপ; বোধ হয় অদ্যাপি ইহারা সম্পূর্ণভাবে তারল্য ত্যাগ করে নাই। নিম্নের

তালিকাব পৃথিবীর সহিত তাহাদের সান্দ্রতার তুলনা দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

গ্রহ		সান্দ্রতা	
বুধ	ক্ষুদ্র গ্রহ	·৩২	(প্রায় সমান)
শুক্র		·৮৯	
পৃথিবী		১·০০	
মঙ্গল		·৭২	
বৃহস্পতি	বড়গ্রহ	·২৪	(অনেক কম)
শনি		·১৩	
উরেনস		·২৩	
নেপচুন		·২১	

বৃহস্পতি আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড়; তাহার অবস্থাও অনেকাংশে সূর্য্যের অনুরূপ। বাশি রাশি বাষ্পীয় পদার্থ মহামেঘের মত, তাহাব বিশাল শরীর আবৃত রাখিয়াছে, এবং মহাবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। প্রবল বাত্যার ন্যায় প্রচণ্ডবেগশালী বাষ্পরাশি বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশে অনুক্ষণ আন্দোলিত হইতেছে। শনিও অনেকাংশে বৃহস্পতিব সদৃশ।

আমাদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, তাহা অপরাপর তারকা-জগৎ পক্ষেও খাটে। প্রত্যেক তারকাই বোধ হয় এক একটী জগতেব কেন্দ্রস্বরূপ, প্রত্যেক জগৎই হয়ত এই একই প্রণালীতে সমুদ্ভূত। তবে কোন তারা অত্যন্ত প্রাচীন, কোনটি বা আধুনিক; কোনটি বা শীতল ও নির্ব্বাণোন্মুখ, কোনটি আজিও নূতন নূতন অঙ্কুরী উৎপাদনে প্রবৃত্ত। আলোক বিশ্লেষ করিয়া দেখা গিয়াছে, সকল তারাই একরূপ পদার্থে নির্ম্মিত। পণ্ডিতেরা নক্ষত্রের বর্ণ দেখিয়া তাহাদের বয়স

নিরূপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন কোন নক্ষত্র যুগ ব্যাপিয়া আলোক বিকিরণ করিয়া অবশেষে পৃথিব্যাদি গ্রহের মত নিষ্প্রভ ও নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

তাহাই যদি সত্য হয়, তবে আকাশের মধ্যে এমন জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা, যাহারা আজিও জীবনোন্মুখ, আজিও যাহারা আদিম বাষ্পময় নীহারিকাঃ অবস্থায় আকাশক্ষেত্রে বিস্তৃত অংশ ব্যাপিয়া আছে, যাহাদের শরীর হইতে ভবিষ্যতে গ্রহ-উপগ্রহ-শোভিত বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ পদার্থের আবিষ্কার হইয়াছিল। দূর-বীক্ষণসহকারে আকাশমধ্যে কুজ্ঝটিকার মত যে সকল নীহারিকা দেখা যাইত, সর উইলিয়ম হর্শেলের মতে সেই সকল নীহারিকাই সেই আদিম বাষ্পময় জগৎ। সর জন হর্শেল তদীয় দূরবীক্ষণ সহকারে দেখাইয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে অনেকে বাষ্পময় নহে—তাহারা অতীব দূরবর্ত্তী ঘনসন্নিবিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জমাত্র। সেই অবধি কোন কোন জ্যোতিষী তাহাদের বাষ্পময়ত্ব অস্বীকার করিয়া লাপ্লাসের উদ্ভাবিত জগতের অভিব্যক্তিবাদ ভিত্তিরহিত হইল বোধ করিতেন। কিন্তু আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তাহাদের কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ-মাত্র হইলেও অনেকেই বস্তুতঃ বাষ্পময়; এতদ্বিষয়ে আর কোনই সংশয় নাই। এই আবিষ্কারও নীহারিকা হইতে জগতের উৎপত্তি সমর্থন করিতেছে।

ধূমকেতু কি? ধূমকেতুও মাধ্যাকর্ষণবলে সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে। ইহাদের আকার নানাবিধ। আয়তন অতিশয় বৃহৎ; ১৮৬১ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ দুইকোটি মাইল দীর্ঘ; ১৮৪৩ অব্দের ধূমকেতুর পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে এগার কোটি মাইল। কিন্তু মস্তকসমেত ইহাদের ওজন

নিরতিশয় অল্প, দুই দশ সের মাত্র; সামান্য কারণেই ইহারা কক্ষভ্রষ্ট হয়। অলোকবিশ্লেষণদ্বারা ইহাদের শরীরে বাষ্পের অস্তিত্ব দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন, ইহারা সৌরজগতের উপাদানভূত বাষ্পরাশির অবশেষমাত্র। আদিম জগতের দুই এক টুক্‌রা বাষ্প কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঙ্কোচনশীল মধ্যস্থ পিণ্ডের অনুসরণ করিতে পারে নাই, তাহারাই যেন আজও ধূমকেতুরূপে বর্ত্তমান। বস্তুতঃ অধিকাংশ ধূমকেতুই সৌবজগতেব মেরুদেশ হইতে আসে, যে তলে গ্রহগণ ভ্রমণ করে, ধূমকেতুদের পথ প্রায় তদুপরি লম্বভাবে বর্ত্তমান।

অগণিত উল্কাপিণ্ড দল বাঁধিয়া ধূমকেতুগণের মত নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরে, নবেম্বর মাসে পৃথিবী এরূপ একটি উল্কাপুঞ্জের পথসন্নিহিত হওয়ায় সেই সময়ে উল্কাবর্ষণ :হয়। উল্কার সংখ্যা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতিরাত্রে দূরবীক্ষণ দ্বারা চল্লিশ কোটি উল্কাপিণ্ড দেখা যাইতে পারে। ইহারা সকলেই পার্থিব উপকরণে নির্ম্মিত, অনুমান হয়, ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জে বেশী পার্থক্য নাই, বস্তুতঃ কোন কোন ধূমকেতু এইরূপ উল্কাপিণ্ডের সমবায়মাত্র।

কোন কোন দূরবীক্ষণে সমুদয় গগনদেশে দুই কোটি তারকা দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রায় এক কোটী আশী লক্ষ ছায়াপথের অন্তর্গত; অবশিষ্ট বিশলক্ষমাত্র ইহার বাহিরে। .দেখা যাইতেছে, যেমন সৌরজগতের প্রায় সকল গ্রহই একতলে অবস্থিত, কেবল দুই চারিটা তল ছাড়াইয়া পড়িয়াছে; সেইরূপ তারকাজগতেও প্রায় সকল তারকাই একতলে অর্থাৎ ছায়াপথতলে অবস্থান করিতেছে; কয়েকটা মাত্র সেই তল ছাড়াইয়া গিয়াছে। তারকাজগৎ ও সৌরজগৎ কতকটা একই রূপ গঠনবিশিষ্ট; তবে বড় আর ছোট।

ধূমকেতুর অনেকেই যেমন সৌরজগতের মেরুদেশের সান্নিধ্য হইতে আইসে, দূরবীক্ষণগোচর নীহারিকাগুলিও সেইরূপ তারকাজগতের মেরুপ্রদেশে অর্থাৎ ছায়াপথ হইতে অতিদূরে দেখা যায়। অনুমান হয় এই বহুকোটি সৌরজগতের সমষ্টিস্বরূপ বিশাল-প্রমাণ নক্ষত্রজগতের নির্ম্মাণাবশেষ আজিও বাষ্পময় নীহারিকাবস্থাতেই বিদ্যমান আছে। এই নীহারিকা হইতে আজিও বোধ করি নূতন সূর্য্যাদি নির্ম্মিত হইতেছে।
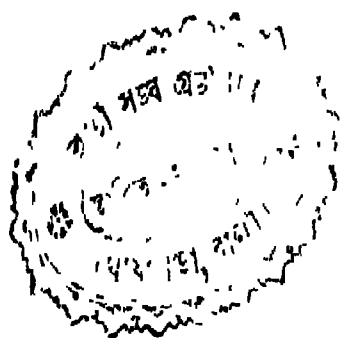
পৃথিবীর বয়স

জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপব আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়; কেননা জননী ভূমিষ্ঠ (?) হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না; সেই জন্য জন্মকাল-নির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠির একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকাল-নির্দ্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন ক্ষমতাপ্রদর্শনে বড়ই লজ্জাবোধ হয়। পক্ক কেশের প্রাচুর্য্য ও লোল চর্ম্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতি বড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।

তবে এরূপ প্রাজ্ঞের অস্তিত্বও বিরল নহে, যাঁহারা কররেখা বা ললাটরেখামাত্র দেখিয়া নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া জন্মকালের রাশি-নক্ষত্রের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; বোধ হয় এই পদ্ধতিরই কোনরূপ বিচারের দ্বারা এককালে স্থির হইয়াছিল, বসুন্ধরার বয়ঃক্রম ছয়হাজার বৎসরমাত্র। আমরা এই সকল কোষ্ঠি-উদ্ধারকের ক্ষমতার প্রশংসা করি; কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত বিচারপ্রণালীর মাহাত্ম্য আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। সুতরাং তাঁহাদের গণনার সত্যতাবিচারে আমাদিগের অধিকারও নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

অগত্যা প্রথমোক্ত আন্দাজনামক বিচারপ্রণালী অবলম্বনে যাহা

ধার্য্য হইয়াছে, তাহারই উল্লেখে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড মতভেদ দেখা যায়। মোটের উপরে ইঁহারা দুই দলে বিভক্ত। একদল বলেন, মাতাঠাকুরাণীর বয়সের গাছপাথর নাই; আর একদল বলেন, জননীর জন্মগ্রহণ, সে ত কালিকার কথা। প্রথম দল চর্ম্মের লোলতা ও ভগ্নদন্তের সংখ্যা দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এই ত সে দিন জননীর জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল, সূতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা দেখিতে পাইতেছি।

আন্দাজ ব্যাপারকে যদি যুক্তি অভিধান দেওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত যুক্তি কতকটা এইরূপে দেখান যাইতে পারে।

ভূবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা প্রথম সম্প্রদায়ের অবলম্বন। আমাদের বর্ত্তুলাকার জননীর দেহের অভ্যন্তরে অস্থিকঙ্কালের বিন্যাস কিরূপ আছে, তাহা ঠিক জানি না, তবে ভিতরটা বড় গরম, এবং সময়ে সময়ে অন্তরিন্দ্রিয় চঞ্চল হইলে যেরূপ হৃৎস্পন্দন ও ক্রোধবহ্নির উদ্গীরণ ঘটে, তাহা হতভাগ্য পুত্রকন্যার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, উপরের চর্ম্মখানি অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে অপোগণ্ডগুলি কোন রকমে কোলে পিঠে চাপিয়া দিন কাটাইতেছে।

উপরের সেই চর্ম্মখানি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দেখা যায়,—কতকটা পেঁয়াজ খোসার মত। কিন্তু হায়, সেই স্তরগুলি অনুসন্ধান করিলে আমাদের কত ভাইভগিনীর অস্থিকঙ্কালের অবশেষ সেই স্তরমধ্যে

প্রোথিত ও নিহিত দেখিয়া আমাদের নিজ পরিণামের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনা হইতে ফেলিতে হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই স্তরমধ্যে যাহাদের দেহাবশেষ দেখা যায়, তাহারাও এক কালে আমাদেরই মত দর্পের সহিত পা ফেলিয়া বিচরণ করিত, কিন্তু আকারপ্রকারে তাহাদের সহিত আমাদের কত প্রভেদ। তাহারাও আমাদের মত জীবধর্ম্মা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কেমন জীব!

স্তরগুলি সর্ব্বত্র যথাবিন্যস্ত নহে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাঁকিয়া জননীর পৃষ্ঠদেশের ভীষণ বন্ধুরতা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু তথাপি মোটের উপর স্তরগুলির বিন্যাসে একটা ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন জীবের অবশেষ স্তরে স্তরে নিহিত দেখি, তাহাদেরও আকারে প্রকারে গঠনে একটা কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক বিকাশ বা উন্নতি বা অভিব্যক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে, অদ্যাবধি অসংখ্য স্রোতস্বতী জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরামে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া গুঁড়িয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে ও সাগরগর্ভে প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে। অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্রধারা "গতপ্রাণী মৃতকায়া" সহস্রজীবের কাকশৃগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিয়াছে।

অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিশরদেশে নীলমুখে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, কত কোটী বৎসর ধরিয়া কত নদনদী ভূপৃষ্ঠের সেই বন্ধুরতাপনোদন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অদ্যাপি যে প্রণালীতে অলক্ষিতভাবে এই স্তরবিন্যাস ব্যাপার চলিয়াছে, অতি প্রাচীন কালেও

যে সেই প্রণালীক্রমেই অলক্ষিতভাবে স্তরবিন্যাস ব্যাপার ঘটিত, তাহাতে সংশয় করিবার সম্যক্ কারণ দেখা যায় না। সেই প্রণালীক্রমেই স্তরের উপর স্তর জমিয়া প্রায় লক্ষফুট স্থূল আবরণখানি ধরণীর পৃষ্ঠোপরি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড় বড় স্রোতস্বতী বৎসরে কত মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়া পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ কতকালে নির্ম্মিত হইয়াছে, কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটি মৃত আচার্য্য হক্সলির নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, তখন বড় বড় ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরে সেই অরণ্য উদ্ভিদের অবশেষ জমিয়া গিয়া একটা বিস্তীর্ণ আস্তরণস্বরূপ হইত। কালক্রমে ভূগর্ভের সঙ্কোচনে সেই ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে পরিণত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য নদনদী মৃত্তিকা আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উপরে বিন্যাস করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভের পূরণ হইলে উহা আবার স্থলে ও মহারণ্যে পরিণত হইত। আবার তাহার উপর উদ্ভিজ্জ আস্তরণ। আবার তদুপরি মৃৎস্তর। এইরূপে কতকাল ধরিয়া উদ্ভিজ্জ স্তরের উপর মৃণ্ময় স্তর, তদুপরি আবার উদ্ভিজ্জ স্তর, জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর ত্বক্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা সেই ত্বকের আবরণ স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া পাথরকয়লা তুলিয়া স্বকার্য্য সাধন করি। ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থূল এক একটা পাথরকয়লার স্তর দেখা যায়, এবং স্থানে স্থানে এইরূপ দুইশত আড়াইশত স্তর উপর্য্যুপরি থাকে থাকে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর, পঞ্চাশ পুরুষ উদ্ভিদের দেহাবশেষ জমিয়া পাথরকয়লার একফুট স্তর জন্মে, মনে কর এক এক পুরুষ উদ্ভিদের জীবনকাল গড়ে দশ বৎসর। তাহা হইলে একফুট স্তর জমিতে পাঁচশ

বৎসর লাগিবে। পঞ্চাশ ফুট স্থূল স্তরের আড়াইশটা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইতে ষাটিলাখ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হইবে।

মনে রাখিও, পাথরকয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর বয়সের এক সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। বুঝিয়া দেখ, পৃথিবীর বয়স কত!

ভূতত্ত্ববিদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কালের আদি কল্পনা করিতে পারি না। অনাদি কালের নিকট কোটি কোটি বৎসর নিমিষের মত। তাই ভূতত্ত্ববিৎ নিঃসঙ্কোচে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক একটা স্তরনির্ম্মাণে দশবিশকোটি বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রায় একই পথে চলেন। জীববিদ্যা বলেন, মানুষেব নিকট-জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্য কোন বিচার-সঙ্গত বিধি কাহারও মাথায় আসে নাই। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসব মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, তাহার নির্ণয় দুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষ বৎসরের মধ্যে মনুষ্যশরীরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্কটদেহের মনুষ্যত্বে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে মর্কট মহাশয়ের অভিব্যক্তিব্যাপারে যে কত কোটি বৎসব অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে।

অতএব নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হইল যে, বিগত কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া ভূপঞ্জরে স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার আজকার মতই ধীরভাবে চলিতেছে; এবং বিগত কোটি কোটি বৎসর মধ্যে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভিব্যক্তির ধারাক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি

হইয়াছে! অর্থাৎ কি না, প্রাচীনা বসুন্ধরার বয়সের কুলকিনারা নাই।

ভূতত্ত্ববিৎ ও জীবতত্ত্ববিৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন সময়ে জগদ্বিখ্যাত সার উইলিয়ম টমসন (লর্ড কেলবিন) একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে—সে বড় বেশী দিনের কথা নয়,—পৃথিবীর অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তখন বসুন্ধরার জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল মাত্র। জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সেই সূতিকাগৃহের প্রাচীরে নির্ম্মাণের তারিখ অঙ্কিত দেখিতেছে। আজ যে ভাবে নদনদী স্তরনির্ম্মাণ করিতেছে, তখনও যে সেই ভাবে স্তরনির্ম্মাণ করিত, তাহা বলা অনুচিত। তখন যে পৃথিবী জীবাধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহের কারণ প্রধানতঃ তিনটি।

প্রথম,—সম্প্রতি পৃথিবী এক দিনে এক পাক আবর্ত্তিত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ঘুরিতেছে, আর চন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রের জলরাশিকে আপনার দিকে টানিয়া রাখিয়াছে। তাই পৃথিবীর আবর্ত্তনে বাধা পড়িতেছে। এই জলরাশির বিপরীতক্রমে বিরুদ্ধমুখে পৃথিবীকে ঘুরিতে হইতেছে। যেন একখানি চাকা বেগে ঘুরিতেছে, আর তাহার পরিধিতে একখণ্ড কাঠ সংলগ্ন থাকিয়া সেই আবর্ত্তনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই ব্যাঘাতের ফলে আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। গত দুই হাজার বৎসরেই আবর্ত্তনের বেগ একটু কমিয়া গিয়াছে, একপাক আবর্ত্তনের কাল একটু বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অহোরাত্রের পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই কারণে বহুদিন হইতে পৃথিবীর আবর্ত্তনের

বেগ মন্দীভূত হইতেছে। সহস্রকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর বেগ বর্ত্তমান বেগেব দ্বিগুণ ছিল, গণনায় কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। আজ কাল যে ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টায় অহোরাত্র হয়, তখন সেই ঘণ্টার বার ঘণ্টায় অহোরাত্র হইত। সুতরাং তখন পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল, তাহাব সহিত আজিকার অবস্থাব কোন তুলনা হইতে পারে না; ভূতত্ত্ববিদেবা যে এক নিশ্বাসে লক্ষকোটি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, জ্যোতির্ব্বিদ্যার হিসাবে তাহার কোন মূল্য নাই। একালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপার দেখিয়া সে কালের স্তরনির্ম্মাণ ব্যাপারের সহিত তাহার কোন তুলনা আনিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়,—সূর্য্য পৃথিবীকে সম্প্রতি যে পরিমাণে তাপ দিতেছে, তাহার মোটামুটি পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই তাপের কিয়দংশমাত্র লইয়া নদনদীর সৃষ্টি ও গতি ও জীবের উৎপত্তি ও লীলাখেলা চলিতেছে। সূর্য্য কিছু চিরকাল ধরিয়া এই পরিমাণে তাপ দিয়া আসিতেছে না। বোধ হয় পাঁচশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য একেবারেই তাপ দিত না। তখন সূর্য্যের তাপবিকিরণশক্তি ছিল না। সুতরাং তখন পৃথিবীতে মেঘবৃষ্টিও ছিল না, নদনদীও ছিল না; জীবের অস্তিত্বের কথাই নাই।

তৃতীয়—পৃথিবী একটা তপ্ত পিণ্ডমাত্র। কেবল উহার উপরের চামড়াটা অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে মাত্র। বৎসর বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাপ পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া দিগন্তে বিকীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ কি না, পৃথিবী ক্রমেই শীতল হইতেছে। আজ পৃথিবীর অবস্থা কেমন, ও বৎসর বৎসর কত তাপ খরচ হইয়া যাইতেছে, জানিলে ভবিষ্যতে কোন্ দিন পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইবে গণিয়া বলা যাইতে পারে। সেইরূপ অতীত কালে, কয়েক কোটি বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীর কখন কি অবস্থা ছিল, তাহাও গণিয়া বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে

পৃথিবী আরও গরম ছিল, সন্দেহ নাই। লর্ড কেলবিনের গণনায় দশকোটি কি জোর বিশকোটি বৎসব পূর্ব্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এত গরম ছিল যে, তখন ভূপৃষ্ঠে শীতল কঠিন চর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। তখন ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ ও তরল ছিল। সুতরাং তখন পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব হয় নাই। টেট্ সাহেবের গণনায় এই কাল দশ বিশ কোটি বৎসর পর্য্যন্তও উঠে না। তিনি দুই এক কোটি বৎসরেব ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহেন না।

দাঁড়ায় এই, পৃথিবীর বয়ঃক্রম বড বেশী নহে—ভূবিদ্যা ও জীব-বিদ্যা বয়সের ইয়ত্তা করিতে চাহেন না, সেটা বিষম ভুল—কয়েক কোটি বৎসর মাত্র, হয়ত এক কোটি বৎসরও নহে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে স্তরবিন্যাস, জীবের উদ্ভব, জীব-পর্য্যায়ে উন্নতি, এই সমুদয় ব্যাপাব হয়ত কয়েক লক্ষ বৎসরমাত্রেই ঘটিয়াছে।

উভয় পক্ষের বিবাদের ফল এইরূপ দাঁড়াইল। ভূপৃষ্ঠের কাঠিন্য প্রাপ্তি পর হইতে যদি পৃথিবীর বয়ঃক্রম হিসাব করা যায় তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি অথবা কয়েক লক্ষ বৎসরমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তৎপূর্ব্বে পৃথিবী এত গরম ছিল যে, তখন জীবনিবাস সম্ভবপর হয় নাই। হয়ত সূর্য্য হইতে সম্যক্ পবিমাণ তাপই তখন আসিত না। হয়ত পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ তখন এত প্রবল ছিল যে, এ কালেব দিবারাত্রি ঋতুপরিবর্ত্তনাদিব সহিত সে কালের তত্তৎ ঘটনার কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। ভূবিদ্যা যে অম্লানভাবে পৃথিবীব পৃষ্ঠেব একখানি সূক্ষ্ম পরদা গাঁথিতে দশবিশকোটি বৎসর চাহিয়া বসেন, এবং জীববিদ্যা যে কেবল মর্কটকে মানুষ বানাইতে বহুলক্ষ বৎসর চাহেন, তাঁহাদের সেইরূপ দাবি অগ্রাহ্য।

আচার্য্য হক্সলি ভূবিদ্যাবিদের ও জীববিদ্যাবিদের তরফ হইতে জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কেলবিন ভূবিদ্যাকে কোটি দশেক বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রথমে রাজি ছিলেন। ভূপৃষ্ঠে প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল স্তরের পরদা জমিয়াছে। তাহা হইলে গড়ে হাজার বৎসরে এক ফুট করিয়া স্তর জমিয়াছে স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে; এবং হক্সলির মতে ভূবিদ্যার পক্ষেও এই পরিমিত কালের অধিক দাবি করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই দশ কোটি বৎসর মধ্যেই লক্ষ ফুট স্তর জমিয়াছে ও এই বিচিত্র জীবজগতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা বিবিধ প্রাণী ও বিবিধ উদ্ভিদের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, ইহা কোনক্রমেই অসম্ভব নহে।

আর একটা কথা, কেলবিনের বিচারপ্রণালীতে কোন ভুলের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যে সকল সংখ্যা লইয়া তিনি হিসাবে বসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কবুল মতে আন্দাজি। ভূপৃষ্ঠে জলস্থলের সমাবেশের একটু ব্যবস্থাভেদ ঘটিলেই, সমুদ্রের জল খানিকটা জমাট বাঁধিয়া বরফ স্তূপের আকারে মেরুপ্রদেশ দিয়া সরিয়া গেলেই, পৃথিবীর আবর্ত্তন বেগে একটু আধটু ব্যতিক্রম হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সময়ে জলস্থলের বা জলবরফের সমাবেশ কিরূপ ছিল, না জানিলে আবর্ত্তনের বেগসম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা কঠিন। লর্ড কেলবিন এই সকল কথা স্বয়ংই তুলিয়াছিলেন। তার পর সূর্য্যের অবস্থা সম্বন্ধে এবং সূর্য্যকর্ত্তৃক বিকীর্ণ তাপের পরিমাণসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই কম, কেলবিন স্বয়ংই এই বিষয়ে স্বকীয় সিদ্ধান্ত কয়েকবার পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং ঠিক্ এত বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্য তাপ বিকিরণ করিত না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাহসিক ব্যাপার। তারপর পৃথিবীর নিজের তাপের কথা। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশটা আমাদের পরিচিত; কিন্তু

উহার আভ্যন্তরিক অবস্থাবিষয়ে আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভূগর্ভে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের তাপপরিচালনক্ষমতা কিরূপ, এবং উষ্ণতাসহকারে তাহাদের তাপপরিচালনক্ষমতা বাড়ে কি কমে, এই সকল গণনায় না ধরিলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গেলে প্রচুর ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। সম্প্রতি লর্ড কেলবিনের জনৈক শিষ্যই গুরুদত্ত গণনার বিশুদ্ধিপক্ষে সন্দিহান হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে আমাদের আরও ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। আজ কেলবিন যেখানে দশকোটি বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন, আর একটু অভিজ্ঞতা বাড়িলেই হয় ত সে স্থলে পঞ্চাশ-কোটী দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ভূবিদ্যাবিদের ও প্রাণিতত্ত্ববিদের পরাজয় স্বীকার করিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আশা করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা জীববিদ্যা প্রতিপক্ষে দণ্ডায়-মান পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া মিট-মাট করিয়া ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইবে।*

---

* অধুনা রেডিয়ম নামক অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কারের ফলে লর্ড কেলবিনের হিসাব উলট পালট হইয়া গিয়াছে।

উত্তাপের অপচয়

সেকালে ও একালে অনেকে ভূত দেখিয়াছেন ও ভূতের আবিষ্কার করিয়াছেন। স্পিরিচুয়ালিষ্টরা ভূতের সঙ্গে কারবার করেন। কিন্তু কেহ ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শুনি নাই। বৈজ্ঞানিকেরা না কি ভূত মানেন না; কিন্তু তাঁহারা ভূতের সৃষ্টি করিতে পারেন। প্রসঙ্গান্তরে পঞ্চভূতের কথা বলিয়াছি, ঐ পঞ্চভূত দার্শনিক পণ্ডিতের সৃষ্টি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গেও ভূতের কথা পড়িতে হইবে; উহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সৃষ্টি। জেম্‌স্ ক্লার্ক মাক্সওয়েল গত শতাব্দীতে কেম্ব্রিজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এক রকম ভূতের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভূতের কথা এই প্রসঙ্গে উঠিবে।

প্রদীপ জ্বালিয়া আমরা রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া থাকি, এবং তজ্জন্য কাষ্ঠ তৈল চর্ব্বি পোড়াইয়া আলো জ্বালি। একালের লোকে গ্যাস পোড়ায়, অথবা কয়লা পোড়াইয়া বা দস্তা পোড়াইয়া বিজুলি বাতি জ্বালায়। মানুষ মনে করে, এ একটা প্রকাণ্ড বাহাদুরি, অগ্নির আবিষ্কারের মত এত প্রকাণ্ড আবিষ্কারই বুঝি আর কখনও হয় নাই। সূর্য্যদেব সন্ধ্যার পর সরিয়া পড়িয়া আমাদিগকে আলোকে বঞ্চিত করেন, কিন্তু আমরা কেমন সহজ উপায়ে ঘোর অন্ধকারেও আমাদের কাজ সারিয়া লই। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া সহজ কথা নহে। সূর্য্যদেব আমাদিগকে ফাঁকি দিতে চান, আমরা কিন্তু দিয়াশলাই ঠুকিয়া আলো জ্বালি, এবং হাজার হাজার মশাল ও প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ও নগর আলোকিত করিয়া তাহার পাল্টা দিই।

প্রকৃতিকে এইরূপে ফাঁকি দিয়া আমরা উৎফুল্ল হই। কিন্তু আমাদের

মধ্যে যাঁহারা দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী, যাঁহাদের নাম বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা সম্প্রতি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমরা ফাঁকি দিতেছি না ফাঁকে পড়িতেছি ?

প্রত্যেক দীপশিখা প্রতি মুহূর্ত্তে বৈজ্ঞানিককে স্মরণ করাইয়া দেয়, তুমি বড় নির্ব্বোধ, অথবা তোমার ভবিষ্যতের চিন্তা আদৌ নাই, তোমার চোখের উপর এত বড় সর্ব্বনাশটা ঘটিতেছে, তাহার নিবারণে তোমার আজ পর্য্যন্ত ক্ষমতা জন্মিল না, ধিক্ তোমার জ্ঞানগর্ব্বকে, ধিক্ তোমার বৈজ্ঞানিকতাকে ! দীপশিখার এই নীরব বাণী বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে তীব্র শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়।

কথাটা হেঁয়ালির মত হইল। কিন্তু এই হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে গেলেই কবিত্ব ছাড়িয়া হঠাৎ বিকট গদ্যে অবতরণ করিতে হইবে।

কথাটা এই। একটা গরম জিনিষের পাশে একটা ঠাণ্ডা জিনিষ রাখিলে সেই ঠাণ্ডা জিনিষটা একটু গরম হয়, আর সেই গরম জিনিষটা একটু ঠাণ্ডা হয় ; বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে খানিকটা তাপ গরম জিনিষ হইতে বাহির হইয়া ঠাণ্ডা জিনিষে যায়। সর্ব্বত্রই এইরূপ। ইহাকে তাপের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রবণতা বলিলেও চলিতে পারে। জল যেমন উচু জায়গা হইতে স্বভাবতই নীচে নামে, তাপও সেইরূপ স্বভাবতঃ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যায়। ইহা অত্যন্ত পুরাতন ও পরিচিত ঘটনা, ইহাতে কোনই নূতনত্ব নাই। জল যেমন স্বভাবতঃ উচ্চ স্থান হইতে নীচে নামে, আপনা আপনি কখনও নীচে হইতে উপরে যায় না, তাপও সেইরূপ কখনও আপনা আপনি ঠাণ্ডা জিনিষ হইতে গরম জিনিষে যায় না। পাঠক কখন যাইতে দেখিয়াছেন কি ? যদি দেখিয়াছি বলেন, তাহা হইতে আপনাকে জল-উচুর দলে ফেলিব।

কিন্তু ইহা সম্ভবপর হইলে মন্দ হইত না। মনে কর, কয়লার উনানের উপর এক ঘটী জল রাখিয়াছি। প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, তপ্ত কয়লা

হইতে তাপ নির্গত হইয়া ঠাণ্ডা জলে যায়, ও ঠাণ্ডা জলকে ক্রমশঃ তপ্ত করিয়া তোলে। যদি ইহার বিপরীত ঘটনা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে ঠাণ্ডা জল হইতে তাপ বাহির হইয়া গরম কয়লায় ক্রমে প্রবেশ করিত ও জলটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বরফে পরিণত হইত। দারুণ গ্রীষ্মে আমরা মফস্বলে বসিয়া কয়লার জ্বালে জল ঠাণ্ডা করিয়া বরফ তৈয়ার করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জগতের বর্ত্তমান নিয়মে ইহা সাধ্য হয় না।

পাঠক মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই নিয়মটা, বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, আপনার মস্তিষ্কের এক কোণে পুরিয়া রাখিবেন।

আর একটা কথা। তাপ নামক নিরাকার বা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থটা অত্যন্ত কাজের জিনিষ, এই ষ্টীমএঞ্জিনের যুগে ইহা বলা বাহুল্য। কলিকাতায় তাড়িতপ্রবাহযোগে ট্রামগাড়ি চলিতেছে। কিন্তু তাড়িত-প্রবাহের মূল কোথায়? কতকটা কয়লা পোড়াইয়া তদুৎপন্ন তাপকে তাড়িতপ্রবাহের শক্তিতে পরিণত করিয়া পরে তদ্দ্বারা ট্রামগাড়ি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাপেরই কিয়দংশ হইতে সহরের রাজপথগুলি রাত্রিকালে আলোক পায়, গৃহস্থেরা আপন আপন ঘরে দীপ জ্বালে ও রান্না করে, অফিস ঘরের টানাপাখা চলে, ময়দা ও শুরকির কল পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। অতএব তাপ পদার্থটা কাজের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাপ হইতে আমরা কাজ পাই কিরূপে? একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

একটা উদাহরণ লও। মনে কর, বর্ত্তমান কালের ষ্টীম এঞ্জিন বা বাষ্পীয় যন্ত্র। এই যন্ত্র তাপকে কাজে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা জল তোলে, গাড়ি টানে, জাহাজ চালায়, ময়দা পিষে, ইত্যাদি। কিন্তু প্রণালীটা কিরূপ? কয়লা পোড়াইয়া তাপ জন্মান হয়। সেই তাপের কিয়দংশ জল গরম করিতে যায়। গরম জল বাষ্প হয়, সেই বাষ্প এঞ্জিনে ঠেলা দিয়া এঞ্জিন চালায় ও কাজ করে, এবং কাজ

করিয়া ঠাণ্ডা জলে মেশে। খানিকটা তাপও সেই বাষ্পের সঙ্গে গরম জল হইতে ঠাণ্ডা জলে যায়। এই গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় যাইবার সময় সেই তাপের কিয়দংশমাত্র কাজে পরিণত হয়। এখন এই কথা দুইটি মনে রাখিতে হইবে।—(১) তাপ গরম জল হইতে ঠাণ্ডা জলে যাইবার সময় তাহা হইতে কাজ পাওয়া যায়। গরম জল যত গরম হইবে, আর ঠাণ্ডা জল যত ঠাণ্ডা হইবে, তত বেশী কাজ পাওয়া যাইবে। গরম জল যদি বেশী গরম না হয় আর ঠাণ্ডা জলও যদি বেশী ঠাণ্ডা না হয়, অথবা উভয় জলই যদি সমান গরম বা সমান ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলে কোন কাজই পাওয়া যায় না। (২) তাপের কিয়দংশমাত্র কাজে লাগে—সমস্ত তাপ কোন রকমেই কাজে লাগে না, যেমনই যন্ত্র তৈয়ার কর না কেন, সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগাইতে কোন মতেই পারা যায় না। গরম জল যদি ফুটন্ত জলের মত গরম হয়, আর ঠাণ্ডা জল যদি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলেও গরম জল হইতে যে তাপ আসে, অত্যুৎকৃষ্ট এঞ্জিন যোগেও তাহার সিকি ভাগও কাজে লাগে না। যে সকল এঞ্জিন লইয়া আমরা কারবার করি, তাহাতে সিকি দূরের কথা, সিকির সিকি কাজে লাগিলেই যথেষ্ট। বাকি সমস্ত তাপটার অপব্যয় হয় মাত্র।

কাজেই তাপ থাকিলেই কাজ পাওয়া যায় এমন নহে, সেই তাপ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যাইবার সময় তাহাকে কাজে লাগান যায়। কিন্তু তখনও আবার সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগান চলে না; তার কিয়দংশ মাত্র, অতি সামান্য অংশমাত্র কাজে লাগে। বাকি সমস্তটা গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে চলিয়া যায়।

এখন বোঝা গেল, কয়লা পোড়াইয়া তাপ খানিকটা জন্মাইতে পারিলেই বিশেষ লাভ হয় না, সেই তাপটা আবার গরম জিনিষে সঞ্চিত থাকা চাই; যত গরম দ্রব্যে থাকিবে, ততই কার্য্যকরী ক্ষমতা অধিক

হইবে, আর যত ঠাণ্ডা আধারে থাকিবে, ততই তাহার কাজ করিবার ক্ষমতা অল্প হইবে। মনে কর, এক সের ফুটন্ত জল আছে, আর এক সের বরফের মত ঠাণ্ডা জল আছে। এখন ছোট্ট একটি এঞ্জিন লাগাইয়া ফুটন্ত জলের তাপ ঠাণ্ডা জলে যাইবার সময় উহার কিয়দংশ,— দুই আনাই হউক আর এক আনাই হউক,—কাজে পরিণত করিতে পারিবে। বাকি চৌদ্দ আনা কি পোনের আনা ঐ ঠাণ্ডা জলে গিয়া ঠাণ্ডা জলকে গরম করিয়া দিবে। দুই আনাই হউক আর এক আনাই হউক, কিছু কাজ এইরূপে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই এক সের ফুটন্ত জল ও এক সের ঠাণ্ডা জল, স্বতন্ত্র না রাখিয়া একত্র মিশাইয়া ফেল, দুই সের মাঝামাঝি রকম গরম—না গরম না ঠাণ্ডা—জল পাইবে; এক্ষেত্রে জলেরও এক কণা নষ্ট হইবে না, তাপেরও এক কণা নষ্ট হইবে না, কিন্তু কাজ এক আনা দূরের কথা, এক ক্রান্তিও পাইবার আশা থাকিবে না।

এক কথায় এইরূপ দাঁড়ায়;—কোন দ্রব্যের যদি একাংশ উষ্ণ থাকে, অন্য অংশ শীতল থাকে, তাহা হইলে উষ্ণাংশ হইতে শীতলাংশে তাপ চলিবার সময় তাহা হইতে কতক কাজ মিলিতে পারে। কিন্তু সেই দ্রব্যের সকল অংশই যদি সমান উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে তাপ এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইতেও চাহে না, তাহা হইতে কাজ পাইবার আশাও থাকে না।

ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যন্ত্রটাকে ত্যাগ করিয়া প্রকাণ্ড বিশ্বযন্ত্রটার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। বিশ্বযন্ত্রের পক্ষেও এই নিয়ম। যে নিয়মে বাষ্পযন্ত্র চলে, এখানেও সেই নিয়মে তাপ হইতে কাজ হয়। বিশ্ব-যন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, সকল স্থল সমান উষ্ণ নহে। দৃষ্টান্ত-সংগ্রহে কষ্ট পাইতে হইবে না। সূর্য্য কি ভয়ানক গরম, আর এই পৃথিবী তাহার তুলনায় কত ঠাণ্ডা, আর তাপ সর্ব্বদাই গরম সূর্য্য

হইতে ঠাণ্ডা পৃথিবীতে আসিতেছে। কিন্তু পৃথিবী প্রতিদিন সূর্য্য হইতে যে তাপ পায়. তাহার কতটুকু কাজে লাগে? কতকটা কাজে লাগে বটে, কেননা, সেই কতকটার জোরেই আমাদেব অশ্বো ধাবতি, বায়্-র্বাতি, জলং পততি, গৌঃ শব্দায়তে, এমন কি, এই জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রায় সকল কার্য্যই তাহারই বলে নির্ব্বাহিত হইতেছে, কিন্তু বাকী যে তাপটা কোন কাজেই লাগে না, কেবল সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে যায় ও পৃথিবী হইতে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, কাহারও কোন কাজে লাগে না, কেবল অপচয়ে ও অপব্যয়ে যায়, তাহার তুলনায় উহার পরিমাণ কত সামান্য।

যাহা যায় তাহা আর আসে না। কত কবি ও কত দার্শনিক কাল-স্রোতের ও জীবনস্রোতের অপচয় দেখিয়া হা হতাশ করিয়া আসিতে-ছেন, কিন্তু এই তাপস্রোতের ভীষণ অপচয় দেখিয়া এপর্য্যন্ত কেহ এক ছত্র কবিতাও লিখিল না, কোন পণ্ডিতও একটা তত্ত্বকথার উপদেশ দিল না।

এই সংসারের নিয়মই এই যে, যাহা যায়, তাহা আর ফিরে না। যে তাপ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যায়, তাহা আর ফিরে না। কেননা, তাপের স্বভাবই এই। জল যেমন স্বভাবতঃ নিম্নপ্রবণ, তাপ তেমনি স্বভাবতঃ শৈত্যপ্রবণ,—ইহার স্বাভাবিক গতিই উষ্ণ স্থল হইতে শীতল স্থানে, একবার শীতল পদার্থে স্থান পাইলে আর উষ্ণ পদার্থে সহজে আসিতে চায় না। মানুষে চেষ্টা করিয়া আপনার শক্তি ব্যয় করিয়া জলকে উচ্চে ঠেলিয়া তোলে, সেইরূপ শক্তি ব্যয় করিয়া খানিকটা তাপকেও ঠাণ্ডা হইতে গরমে তুলিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতির এমনি বিধান, যে এক গুণ তাপকে উষ্ণ স্থলে তুলিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দশ গুণ তাপ অন্যত্র শীতল স্থল হইতে শীতলতর স্থলে নামিয়া যায়।

ফলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাপ ক্রমেই উষ্ণ হইতে শীতল দ্রব্যে চলিতেছে, ক্রমেই তাপের কার্য্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হইতেছে; যাহা ছিল গরম, তাহা শীতল হইতেছে; যাহা ছিল শীতল, তাহাও হয় ত গরম হইতেছে। কিন্তু ভবিতব্য অবশ্যম্ভাবী; শেষ পর্য্যন্ত জগতে বর্ত্তমান সমস্ত তাপ একাকার উষ্ণতাপ্রাপ্ত হইবে। জগতের এখানটা গরম, ওখানটা ঠাণ্ডা, এরূপ শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে না, সর্ব্বত্রই সমান গরম বা সমান শীতল হইয়া যাইবে। তখন তাপ থাকিবে বটে, কিন্তু সেই তাপকে কেহ কাজে লাগাইতে পারিবে না, সেই তাপ হইতে কোন কাজ উৎপাদন করিবার কোন উপায় থাকিবে না। জগদ্‌যন্ত্র তখন নিশ্চল হইবে, বিশ্বঘটিকার পেণ্ডুলম তখন স্পন্দহীন হইবে, চাকাগুলি আর নড়িবে না; কাঁটাগুলি থামিয়া যাইবে। সেই দিন বিজ্ঞানমতে জগতেব মহাপ্রলয়। সেই মহাপ্রলয় নিবারণে মনুষ্যের কোন ক্ষমতা নাই। তবে তাপের অপচয় যথাসাধ্য নিবারণ কবিয়া শেষের সেই ভয়ঙ্কব দিন যৎকিঞ্চিৎ বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা মানুষের হস্তে কিয়ৎপরিমাণে আছে বটে। কিন্তু মানুষ কি সেই অপচয়েব নিবারণে চেষ্টা করে? একালের উন্নত পদ্ধতি বিজ্ঞানবিদ্যা এই তাপের অপচয় প্রতিবিধান করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছে কি? ববং তাহাব বিপরীত কাণ্ডই দেখা যাইতেছে। প্রকৃতিদেবী কতকটা যেন দয়াবশ হইয়া যে মৃদঙ্গার-রাশি ও কেরোসিন তৈলের রাশি অপবিণামদর্শী মনুষ্যের চক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভমধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ মনুষ্য তাহার সন্ধান পাইয়া সেই যুগান্তসঞ্চিত সম্পত্তি তুলিয়া আনিতেছে ও আপনার তাৎকালিক সুবিধাব জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে পোড়াইয়া শীতল বায়ুতে পরিণত করিতেছে। পৃথিবী যুড়িয়া কলকারখানার এঞ্জিনে এই নৈসর্গিক শক্তি সমষ্টি মুহূর্ত্তে অপচিত হইয়া যাইতেছে, তজ্জন্য কেহ পরিতাপ করে না, কেহ

আক্ষেপও করে না। কেবল দুই একজন বৈজ্ঞানিক তাপের এই অপচয় দেখিয়া বিহ্বল হন ও সেই সঙ্গে জগতের পরিণাম ভাবিয়া আতঙ্কিত হন।

এতক্ষণে বোধ হয় হেঁয়ালি ভাঙিল; আঁধারে আলো জ্বালিয়া প্রকৃতি দেবীকে ফাঁকি দিতে গিয়া আমরা নিজেই ফাঁকে পড়িতেছি, এই হেঁয়ালির তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে আমরা চাই কিঞ্চিৎ আলোক, যৎকিঞ্চিৎ শক্তি। আকাশ বা ঈথর মধ্যে কিয়ৎ-কাল ধরিয়া গোটাকত কম্পনতরঙ্গ উৎপাদন করিলেই আমাদের কাজ চলে। কিন্তু তজ্জন্য আমরা তেল পোড়াইয়া, বাতি পোড়াইয়া, গ্যাস পোড়াইয়া, দস্তা পোড়াইয়া, সহস্র গুণ পরিমাণ শক্তিকে অপচয় করিয়া তাহার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিয়া ফেলি। চাই আমরা একখানা হাত-পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করিতে, আমাদের উদ্ভাবিত উপায় একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলে। শক্তির এই অপচয় দেখিলে বুদ্ধিমান্ লোকে ব্যথা পায়, দূরদর্শী লোকে ব্যাকুল হয়। ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর। আচমনে এক গণ্ডুষ জল আবশ্যক, আমরা হিমালয় হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গা আনিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত করি, এবং তজ্জন্য একটা রাজ্যের তহবিল অপব্যয় করি। বিশল্যকরণীর একটা শিকড়ের জন্য আমরা প্রকাণ্ড গন্ধমাদনকে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের আয়োজন করি। প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রহসন; কিন্তু এই প্রহসনের পরিণাম যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে হাস্যরসের অপেক্ষা করুণরসের সঞ্চার হওয়াই উচিত।

ভরসা করি, এখনও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া মনুষ্য-জাতিকে সমস্ত কলকারখানা এঞ্জিন বন্ধ করিতে উপদেশ দিবেন, রাত্রিতে অন্ধকারে কারবার করিতে বলিবেন, এবং পাকশালার উনান-গুলির অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া মনুষ্যজাতিকে সত্যযুগোচিত আমায়

ভোজনে প্রবৃত্তি দিবেন। এইরূপ করিলে অন্ততঃ শেষের সেদিন কিছু-কাল বিলম্বিত হইতে পারিবে।

বিলম্বিত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। প্রকৃতি সর্ব্বদা বিলাসী ধনিসন্তানের মত সঞ্চিত শক্তি-সম্পত্তি দুই হাতে অজস্র অপব্যয় ও অপচয় করিতেছেন, তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখা যায় না। প্রকৃতিকে এই অপব্যয়ে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিবে, এমন লোক কোথায়? মনুষ্যের পক্ষে ইহার প্রতিবিধান আপাততঃ অসাধ্য।

মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু মাক্সওয়েলের কল্পিত ভূতের অসাধ্য নহে। যদি আমরা কোনরূপে সেই উপদেবতাটিকে কোনরূপে বশীভূত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বযন্ত্রটা আরও কিছুদিন টিকিতেও পারে; এমন কি, ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতাও হয়ত তাঁহার নির্ম্মিত বিশ্বযন্ত্রটিকে অকালে অচল হইতে দেখার ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

সেই ভূতের কাজ কি? জগতের বর্ত্তমান অবস্থা এই যে খানিকটা গরম জল ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল একত্র মিশাইলে দুই সমান গরম হইয়া পড়ে, গরম জলটা একটু ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা জলটা একটু গরম হয়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। জগৎটাকে ভবিষ্যৎ মহা-প্রলয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্যের দর-কার। খানিকটা না-গরম না-ঠাণ্ডা 'নাতিশীতোষ্ণ' জল একটা পাত্রে রাখিলাম, একটু পরে গিয়া যেন দেখিতে পাই যে পাত্রের অর্দ্ধেক জল ফুটিতেছে; বাকি অর্দ্ধেক বরফ হইয়া রহিয়াছে। তাপ আপনা হইতে সরিয়া গিয়া জলের একাংশ হইতে অন্য অংশে গিয়াছে। এইরূপ ঘটনা বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অসম্ভব—এই ব্যাপারটা সাধ্যে পরিণত করিতে হইবে। মাক্সওয়েল নিজে ইহা পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার কল্পিত ভূতে ইহা পারে; কিরূপে পারে, বলিতেছি।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। মনে কর, দুইটা ঠিক সমান আয়-তনের কুঠরির মাঝে একটা দেওয়ালের ব্যবধান আছে ও সেই দেওয়ালে একটা ক্ষুদ্র জানালা আছে। জানালাটা অতি ছোট; এত ছোট যে বিনা আয়াসে কেবল ইচ্ছামাত্র খোলা যায় বা বন্ধ করা যায়। কুঠরি দুইটার অন্য কোথাও জানালা দরজা বা কোন ফাঁক পর্য্যন্ত নাই। একটা কুঠরিতে বাতাস পূরিয়া রাখিয়াছি, আর একটা কুঠরিতে বায়ু পর্য্যন্ত নাই; উহা একেবারে শূন্য। প্রথম কুঠরিতে যে বায়ুটা আছে, মনে কর তাহা বৈশাখ মাসের বায়ুর মত তপ্ত বায়ু। এখন মাঝের দেওয়ালের জানালা খুলিয়া দিবামাত্র খানিকটা হাওয়া এ কুঠরি হইতে ও কুঠরিতে যাইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, উভয় কুঠরি বায়ুপূর্ণ হইয়াছে। যে বায়ু একটা ঘরে আবদ্ধ ছিল, তাহা এখন দুইটা ঘর অধিকার করায় তাহার চাপ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু উষ্ণতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূর্ব্বে একটা ঘরে বায়ু যেমন গরম ছিল, এখন সেই বায়ু দুই ঘরে আসিয়াও তেমনি গরমই রহিয়াছে। এইরূপে এক ঘরের বায়ু অন্য শূন্য ঘরে চালাইয়া দিলে তাহার উষ্ণতার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। জগদ্বিখ্যাত জুল সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন।

বায়ুর উষ্ণতার কারণ কি? বায়ুর অণুগুলি অনবরত এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে; যাহার গায়ে লাগে, তাহাকেই ধাক্কা দেয়, যত জোরে ধাক্কা দেয়, ততই বায়ু গরম বোধ হয়। একটা ছোটখাট কুঠরিতে কত কোটি কোটি বায়ুর অণু আছে। প্রত্যেক অণুই ইতস্ততঃ বেগে ছুটিতেছে; সে বেগই বা আবার কি ভয়ঙ্কর! যে বায়ুতে আমাদের গৃহ পূর্ণ, তাহার অণুগুলির বেগ প্রতি মিনিটে প্রায় কুড়ি মাইল। রেলের গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল হিসাবে চলে; আর এই বায়ুকণিকাগুলি মিনিটে প্রায় কুড়ি মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায়

বার শ মাইল, বেগে ছুটাছুটি করে। আবার বায়ুর উষ্ণতা যত বাড়ে, এই অণুগুলির বেগও ততই বাড়ে।

মনে করিও না যে, সকল অণু ঠিক একই বেগে চলে। উপরে যে মিনিটে বিশ মাইল বেগের কথা বলিলাম, তাহা একটা গড় হিসাবে। কোন অণু হয় ত বিশ মাইলের অনেক অধিক বেগে ছুটিতেছে, কোনটা হয় ত বিশ মাইলের অনেক কম বেগে ছুটিতেছে। তবে সকলের বেগ গড়ে বিশ মাইল। উষ্ণতাবৃদ্ধিসহকারে বেগের এই গড়টা বাড়িয়া যায় ও উষ্ণতা কমিলে গড়টা কমিয়া যায় মাত্র।

এখন মনে কর, এই বায়ু একটা কুঠরিতে আবদ্ধ আছে, তাহার কোটি কোটি অণু গড়ে বিশ মাইল হিসাবে প্রতি মিনিটে এদিক ওদিক ছুটিতেছে, কুঠরির দেওয়ালে ধাক্কা দিতেছে ও ধাক্কা পাইয়া আবার অন্য মুখে ছুটিতেছে। বেগ গড়ে বিশ মাইল, কাহারও বা বিশ মাইলের বেশী, কাহারও বিশ মাইলের কম,—গড়ে বিশ মাইল। এখন মনে কর, সেই ভূতটি সেই জানালার কাছে বসিয়া আছেন এবং ইচ্ছামত জানালা খুলিতেছেন বা বন্ধ করিতেছেন। তাঁহার দেহখানি অতি সূক্ষ্ম, দেবযোনি কি না! তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়ও তদ্রূপ সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তিবিশিষ্ট। আমাদের কি সাধ্য যে বায়ুর অণু পরমাণু লইয়া কারবার করি! কিন্তু সেই সূক্ষ্মদেহ উপদেবতা তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেক অণুর গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণুকে তাঁহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিতে পারেন। এখন মনে কর, তিনি জানালার পাশে বসিয়া নিবিষ্টমনে বায়ুর অণুগুলির গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতেছেন, যে অণু বিশ মাইলের অধিক বেগে জানালায় আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহাকে সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া পাশের কুঠরিতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন, আর যে অণুটা মন্দ গতিতে অর্থাৎ বিশ মাইলের কম বেগে আসিতেছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ "প্রবেশ

নিষেধ” বলিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কি দেখিবে? পাশের ঘরে ক্রমাগত দ্রুতগামী অণুগুলি জমিতে থাকিবে; তাহাদের সকলেরই বেগ বিশ মাইলের অধিক; কাজেই তাহাদের গড়ে বেগ বিশ মাইলের অধিক হইবে। আর অন্য গৃহে দ্রুতগামী অণুর সংখ্যা ক্রমেই কমিবে ও মন্দগতি অণুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িবে; সেখানে অণুগুলির গড় বেগ ক্রমেই কমিয়া যাইবে। আবার বেগের বৃদ্ধির ফল বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি, আর বেগের হ্রাসের ফল বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস। কাজেই কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, একটা কুঠরির বায়ু ক্রমেই শীতল হই-তেছে ও অন্য কুঠরি ক্রমেই উষ্ণতর বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। দুটী ঘরের বায়ুর উষ্ণতা এইরূপে ভিন্ন হইয়া গেল, অথচ সেই দৈত্য মহাশয়কে এক কণিকা শক্তি খরচ করিতে হইল না, কেননা, তাঁহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির সঞ্চালনে ক্ষুদ্র গবাক্ষের ক্ষুদ্র কপাটখানির নাড়াচাড়ায় শক্তি ব্যয়ের অপেক্ষাও রাখে না। তাঁহার দেহখানি যেমন ইচ্ছা সূক্ষ্ম মনে করিতে পার। যে কপাটখানি তিনি নাড়িতেছেন, তাহাও যত ইচ্ছা হালকা মনে করিতে পার। অত হালকা কপাট খুলিতে বা বন্ধ করিতে আর শক্তি খরচ কোথায়? কিন্তু ফলে হইল কি? ছিল একটা কুঠরিতে সর্ব্বত্র সমান গরম খানিকটা হাওয়া; এখন পাওয়া গেল দুইটা কুঠরির একটায় গরম হাওয়া, আর একটায় ঠাণ্ডা হাওয়া। এখন তুমি সচ্ছন্দে একা ছোট এঞ্জিন যোগে উষ্ণ বায়ুর তাপকে শীতল বায়ুতে চলিতে দিয়া সেই তাপের কিয়দংশ কাজে লাগাইতে পার। আমাদের যাহা অসাধ্য, ঐ ভূতের তাহা সাধ্য। তিনি মনে করিলেন যে কোন দ্রব্যের দ্রুতগামী অণু-গুলিকে এক ধারে ও মন্দগামী অণুগুলিকে অন্য ধারে গোছাইয়া রাখিয়া এক ধার তপ্ত ও অন্য ধার ঠাণ্ডা করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে শক্তির অপচয় নিবারণ করিয়া জগদ্‌যন্ত্রের বর্ত্তমান ব্যবস্থাটাই বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু যথেচ্ছ পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে পারেন।

এই দেবতাটি ক্লার্ক মাক্সওয়েলের মানস-পুত্র। ব্রহ্মার মানস-পুত্র হইতে জগতে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকের মানস-পুত্র, ব্রহ্মা আমাদের যে উপকারটুকু করেন নাই, তাহা সম্পাদনে সমর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দেবযোনিটির সহিত সাক্ষাৎকারের ও তাঁহার বশীকরণের উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, আবিষ্কারের সম্ভাবনাও দেখা যায় না, অতএব আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম।

বিশ্বজগতের কোন না কোনখানে এইরূপ দেবযোনিগণ বসিয়া অণুগুলিকে লইয়া বাছাই করিতেছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কাজেই জগদ্‌যন্ত্রের কাঁটা হয়ত একদিন অচল হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কা রহিয়া গেল। তবে সমস্ত বাতি নিবাইয়া উনান নিবাইয়া আমরা সেই দিন কতকটা বিলম্বিত করিতে পারি। তাহা করিব কি?

সৃষ্টি

আফ্রিকানিবাসী কোন অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত আছে। চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া জগতের সৃষ্টি ঘটনাটা সমাহিত হইয়া যায়; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে সৃষ্ট জগৎটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিবাদ হইল চাঁদে ও ব্যাঙে; তাহার ফলভাগী হইল মানুষে, আধিব্যাধি জরামরণ আসিয়া জগৎ অধিকার করিল।

চাঁদের ও ব্যাঙের স্থলে আর দুইটা প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞজনানুমোদিত আর একরকম সৃষ্টিতত্ত্বের বড় বৈষম্য দেখা যায় না। বিবাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে; ফল-ভাগী হইয়াছে দুর্ভাগা মানুষ।

শয়তানের আকারপ্রকার সম্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ আছে কি না, বিশেষ জানি না। শুনা যায়, বিখ্যাত ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিৎ কুবীয়ের সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হইয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কুবীয় সহজে ভয় পাইবার ব্যক্তি ছিলেন না। বৈজ্ঞানিকোচিত গাম্ভীর্য্য সহ-কারে তিনি শয়তানকে বলিলেন, বাপু হে, শিঙে ও খুরেই ধরা পড়িয়াছ; মাংস হজম করিবার শক্তি রাখ না, আমাকে হজম করিবে কিরূপে? কিঞ্চিত ঘাস দিতেছি, রোমন্থন কর।

প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া কাটিয়া কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। এক সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না, এই বৈচিত্র্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন ছিল। ছিল বোধ করি কেবল দেশ আর কাল— শূন্য দেশ আর শূন্য কাল, আর ছিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা নির্গুণ, কি গুণময়, তাহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক করিতে পার, কিন্তু অন্ততঃ

একটা উপাধি তাঁহাতে বিদ্যমান আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা সৃষ্টির কল্পনা হয় না ; সেটা সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা। স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেন, জগৎ উৎপন্ন হউক, আর জগতের সৃষ্টি হইল ; নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল ; কিছুই ছিল না, সবই হইল ; দেশের ও কালের শূন্যতা পূর্ণ হইল। এই ঘটনার নাম সৃষ্টি, স্রষ্টার ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহার পূর্ব্বে কি ছিল, কি হইত, জিজ্ঞাসা করিও না ; উত্তর মিলিবে না। ইহার পরে কি ঘটিয়াছে বা কি ঘটিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার ; উত্তরপ্রাপ্ত দুরাশা নহে। এই সৃষ্টিব্যাপার একমাত্র অসাধারণ ঘটনা ; জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। একবারমাত্র কোন একটা সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত আমরা জানি, আর কখনও ঘটিয়াছিল কি না, আর কখনও ঘটিবে কি না, তাহা জানি না।

তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইল ; এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত থাকিলে চলে কি? না,—আর একটু বলা আবশ্যক, তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হউক ; এবং তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্ট জগৎ এইরূপে এইভাবে এই পথে চলুক, তাই জগদ্‌যন্ত্র সেইরূপে সেই ভাবে সেই পথে চলিতে লাগিল। যিনি জগতের স্রষ্টা, তিনিই জগতের বিধাতা।

সৃষ্টিতত্ত্বরূপ মহাবৃক্ষের আগাছা পরগাছা শাখাপল্লব ছাঁটিয়া কাটিয়া কেবল কাণ্ডটুকু বা মূলটুকু রাখিলে, উল্লিখিত কথাকয়টির অধিক কিছু থাকে না। জগৎ আছে—স্রষ্টার ইচ্ছা, জগৎ চলিতেছে—বিধাতার বিধানে, এই কথা কয়টির উপর বড় বিবাদবিসংবাদ নাই, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু আরও অনেক কথা আছে, যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

কেহ বলেন, জগৎ বৃহৎ প্রকাণ্ড অসীম ; অথচ কেমন সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্

সুদূর অতীত সুদূর ভবিষ্যতের সহিত কেমন বাঁধা ; সুতরাং বিধাতা সর্ব্বজ্ঞ।

কেহ বলেন, জগৎ কেমন সুন্দর ; সুতরাং স্রষ্টাও সৌন্দর্য্যময়। কেহ বলেন, জগৎ বড় সুখের ; ঈশ্বর করুণাময়।

আবার কেহ বলেন, জগতে পুণ্যের জয়, অতএব ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা। ইত্যাদি।

এইরূপে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলেন ও তুমুল কোলাহল করেন। কত হাজার বৎসর ধরিয়া কোলাহল চলিতেছে, কবে নিবৃত্তি হইবে, বলা যায় না।

কেননা, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ আসিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করে, ঈশ্বর সৌন্দর্য্যময়, তবে জগতে কুৎসিতের অস্তিত্ব কেন? ঈশ্বর করুণাময়, তবে জগতে দুঃখ কেন? ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা, তবে দুর্ব্বলের পীড়ন কেন?

উত্তর,—ও সব শয়তানের কারসাজি। শয়তান ঈশ্বরের বিরোধী, আহ্রিমান অহুরমজ্‌দের বিরোধী।

তবে কি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন?

উত্তর,—কেন, শয়তান ত জব্দ আছে।

তার চেয়ে শয়তানের নিপাত হইলেই ত [illegible]

উত্তর,—ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এ কেমন ইচ্ছা, বলা যায় না। শয়তান বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছে, তথাপি শক্তি সত্ত্বেও তাহার নিপাত করিব না,—মন্দ ইচ্ছা নয়!

আর এক রকম উত্তর আছে। তোমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা দুঃখ, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে তাহা করুণা। তোমার বিকৃত দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, বিধাতার নির্ম্মল দৃষ্টিতে তাহা সুন্দর।

নষ্টবুদ্ধির প্রশ্ন,—আমার চক্ষুটা এমন বিস্তৃত করিল কে?

কূটবুদ্ধি লোকে বলে, কুৎসিত অস্বীকার করিলে সুন্দর থাকিবে না; দুঃখের অস্তিত্ব না মানিলে সুখের অস্তিত্ব থাকে না। যদি সুখ আছে মানিতে চাও, দুঃখ মানিতে হইবে। বিধাতা যদি করুণাময় হন, তবে তিনি দুঃখেরও সৃষ্টিকর্ত্তা।

বৈজ্ঞানিক বলিবেন, প্রকৃতিতেই করুণা নাই। যে একটু সুখ বিদ্যমান, দুঃখ হইতে তাহার উৎপত্তি, দুঃখেই বুঝি সমাপ্তি। ধর্ম্মের জয় মিথ্যা কথা, প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে। স্থূলদৃষ্টিতে বোধ হয়, শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মেরই জয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের সমান গতি; উভয়েরই বিনাশ। এ কথার উত্তর নাই। কেহ বলেন, চুপ কর, বিধাতার উদ্দেশ্য—behind the evil—মানবদৃষ্টির অন্তরালে। কেহ বলেন, তুমি নির্ব্বোধ। কেহ বলেন, দেখ দেখি, এ লোকটার কুম্ভীপাকের ভয় নাই। অপরে বলেন, এস, ইহাকে পোড়াইয়া মারি।

সুবোধ লোকে আসিয়া মীমাংসার চেষ্টা করে। এস ভাই, গণ্ডগোলে দরকার নাই। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলেই মানিয়া থাকি; ঈশ্বর ইচ্ছাময়; তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি কখন না কখন হইয়াছে। নতুবা এই এত বড় প্রকাণ্ড পদার্থ জগৎটা আসিল কোথা হইতে? তবে কোন্ সময়ে, কিরূপে, কেন ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। সে সব অজ্ঞেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাময়ত্বটুকু বজায় রাখিয়া ঈশ্বরকে নিরুপাধিক বল, ক্ষতি নাই; অজ্ঞেয় বল, আরও ভাল। জগৎ একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র, এই যন্ত্রের উদ্ভাবনে একজন যন্ত্রীর ইচ্ছা আবশ্যক, তাই ঈশ্বর স্বীকার কর্ত্তব্য এই যন্ত্রচালনেও একজন যন্ত্রীর শক্তি আবশ্যক। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সেই শক্তি। তোমরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বল, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছারই বিকাশমাত্র। যন্ত্রটি সুগঠিত, নিয়মিত, বেশ সুস্থ ভাবে চলি-

তেছে ; ইহা যন্ত্রীর মাহাত্ম্য।—তবে মাঝে মাঝে মরিচা পড়িলে মেরামতের দরকার হয় কিনা, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কেহ বলেন, মেরামতের দরকার হয় ; সেই মেরামতের নাম মিরাকল্।

এই কথাগুলি শুনিতে বেশ; মীমাংসক মধ্যস্থের উপযুক্ত বটে। কিন্তু দুই একটা এমন উদ্ধতস্বভাব লোক দেখা যায়, তাহারা মধ্যস্থের কথায় তৃপ্ত হয় না। তাহারা বলে, যন্ত্রী আছে, অতএব যন্ত্র আবশ্যক, অতএব ঈশ্বর স্বীকার্য্য, এরূপ যুক্তি চলিবে না। ঘটের জন্য কুম্ভকার আবশ্যক, সুতরাং বিশ্বজগতের জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রয়োজন, এ যুক্তিটা কিন্তু ঠিক নহে। প্রথম, কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করে, বুদ্ধি যোগাইয়া তাহার আকার দেয় মাত্র, ঘটের উপাদান করে না। ঘটের উপাদান যে মাটি, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ তৈয়ারী মালমশলার উপর বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর জগৎ গড়িয়াছেন, এই পর্য্যন্ত এ যুক্তিতে আইসে ; সেই ব্রহ্মাণ্ড গড়িবার মশলা কোথা হইতে আসিল, এ কথার উত্তর পাওয়া যায় না। কিছু না হইতে কিছুর উৎপত্তি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে—মানুষের কল্পনার অতীত। সুতরাং সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই, তবে বিশ্বাস কর, সে কথা স্বতন্ত্র ; যুক্তির কথা তুলিও না।

জগতের মশলা কোথা হইতে আসিল, ইহার উত্তর মিলিল না। তবে মশলা দেওয়া থাকিলে জগদ্‌যন্ত্র নির্ম্মিত হইল কিরূপে, ইহা যুক্তির বিষয় হইতে পারে। ইহা বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচার্য্য ; বিজ্ঞান কষ্টে সৃষ্টে যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, যাহাকে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, তাহারই দ্বারা জগতের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও ক্রিয়াপ্রণালী সঙ্গতভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে কতক কতক বুঝা যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে, এ কথার উত্তর মিলে না, তবে কিরূপে হইতেছে তাহার উত্তর বিজ্ঞানের

নিকট মিলিতে পারে। যে ভাবের ব্যখ্যায় মন তৃপ্তি লাভ করে, সেই ভাবের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে। অন্য কোনরূপে বুঝিবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই; সে প্রয়াসও বিজ্ঞান করে না।

বিজ্ঞানের মতে ঈশ্বর এবং পরমাণু, এই দুই মশলাতে জগৎ নির্ম্মিত। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সমুদয় জানিলে কিরূপে জগৎ গঠিত হইয়াছে কিরূপে চলিতেছে ও কিরূপে চলিবে, বৈজ্ঞানিক তাহা বলিবার ভরসা করে। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিতে পার। এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারগণের অন্যতম অগ্রণী মহামতি ক্লার্ক মাক্সোয়েল একদা বলিয়াছিলেন পরমাণুগুলি যেন ছাঁচে ঢালা, অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম এখানে পরাহত; এইখানে একজন শিল্পীর আবশ্যকতা। মনুষ্যের বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যেখানেই কিয়ৎক্ষণের জন্য পরাবৃত্ত হইয়াছে, সেইখানেই হাল ছাড়িয়া নিরাশভাবে বলিয়াছে, এইখানে একজন শিল্পীব আবশ্যকতা। পরমাণুর গঠনে শিল্পীর আবশ্যকতা কি না, যাঁহারা মানবচিন্তার বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করিয়া অগ্রণী মাক্সোয়েলের পদানুসরণ করিতেছেন, তাঁহারই বোধ করি তাহার উত্তর দিবেন।

আর এক দল আছেন, তাঁহারা বলেন, জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন, জগৎ ছাড়া ঈশ্বরের কল্পনার দরকার নাই। জগৎ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। অবশ্য এই মতানুসারে সৃষ্টিশব্দের সার্থকতা নাই; সৃষ্টিব্যাপার বা ঘটনা বলিয়া কিছু কখন সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ বুঝায় না। বহু দেশে এই মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বহু দর্শনশাস্ত্রে এই মত মজ্জাগত। এই দলকে ইংরেজিতে স্থূলতঃ pantheists বলে, ইহাদিগকে নিরুত্তর করা বড়ই কঠিন, তবে গালি দেওয়া চলে।

মানবজাতি বহুদিন হইতে দৃঢ়ভিত্তি সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের বিশ্বাস, জগৎ

নামে একটা অসীম বিচিত্র প্রকাণ্ড পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া এবং বোধ করি অনাদি কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। মনুষ্য সেই জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ; সে তাহার খানিকটামাত্র দেখিতে পায় ও কিছুক্ষণমাত্র ধরিয়া দেখে। জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির সহিত সেই অসীম জগতের পরিচিত অংশের পরিধিটুকু ক্রমে প্রসার লাভ করে বটে, কিন্তু অসীমের তুলনায় জ্ঞানগত অংশের পরিমাণ সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বতোভাবে নগণ্য। সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি সংকীর্ণ অংশে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে, কিন্তু এই পরিধির বাহিরে আরও সর্ব্বতোভাবে বিশালতর যে অংশ রহিয়াছে, তাহার কিয়দংশের সহিত ক্রমশঃ আমাদের চেনাশুনা ঘটিতে পারে, কিন্তু সমগ্রটা কখনই জ্ঞানের সীমানার ভিতর আসিবে না। এই প্রকাণ্ড পদার্থটা একটা প্রকাণ্ড জটিল যন্ত্রবিশেষ, তবে যতই আমরা ইহার সহিত পরিচিত হই, ততই ইহার জটিলতা মুক্ত হয়; ততই আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি সুসঙ্গত নিয়মের শৃঙ্খলায় সমুদায় চাকাগুলি পরস্পরকে আবদ্ধ রাখিয়াছে; এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিলেই জগদ্‌যন্ত্রের জটিলতা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের এইমাত্র সম্পাদ্য।

একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এই মতটা অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আমা ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা ঠিক্ প্রতিপন্ন হয় না। আমি আছি, এটা যেমন প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য, আর কিছু আছে, তাহা ঠিক্ তেমন সত্য নহে, এবং তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া মিলে না।

সাংখ্যদর্শন-জ্ঞাতা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞেয় প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং পুরুষপ্রকৃতির পরস্পর সম্পর্কে ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির অস্তিত্ব একটা hypothesis বা কল্পনা মাত্র; এই কল্পনা ব্যতীতও যদি জগতের অভিব্যক্তি অন্যরূপে বুঝা যায়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে সম্মত না

হইতেও পারেন। সেকালে বৈদান্তিক ইহা স্বীকার করিতেন না; এ কালে বার্কলির পরবর্ত্তী বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইহা স্বীকার করেন না। আমি জগতের অংশ, ততদূর সত্য নহে, জগৎ আমার অংশ, এ কথাটা যতদূর। জগৎ না থাকিলে আমি থাকিতাম না, বোধ করি, ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আমি না থাকিলে জগৎ থাকিত না, এটা বোধ হয় কতকটা সাহসের সহিত বলিতে পারি। আমাকে ছাড়িয়া ব্যক্ত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না, উহা আমারই কল্পনা বা কারিকরি। জ্ঞান-বিস্তারের সহিত জগতের একটু, আর একটু, আর একটুর সহিত ক্রমশঃ আমার পরিচয় হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে; আমারই চেতনার বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে সৃষ্টি বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, বরং ঠিক্।

কতকগুলি চিৎপদার্থ বা চৈতন্যকণার সমবায়ে আমার চেতনা। চৈতন্যের এমন একটি বিশেষ শক্তি আছে যে, সে আপনার সমগ্রটাকে অর্থাৎ সমুদায় ব্যষ্টীভূত চৈতন্যকণার প্রবাহটাকে সমষ্টিরূপে একভাবে দেখিতে পায়; সমস্ত চেতনাপ্রবাহকে একের চেতনা বলিয়া চিনিয়া লয়, ইহা হইতেই আমি জ্ঞানের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সেই চিৎপ্রবাহের অন্তর্গত চৈতন্যকণাগুলিকে এক এক করিয়া, খুঁটিনাটি করিয়া বাছিয়া গোছাইয়া সাজাইয়া দেখিতে চায়; আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করে, এই বিশ্লেষণ-চেষ্টায় চেতনার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ। চেতনার তিনটা অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে—সুষুপ্তাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা। মনে করা যাইতে পারে যে সুষুপ্তাবস্থায় চৈতন্যের এই আত্মবিশ্লেষণশক্তি জন্মে নাই; চৈতন্য হয়ত আছে, কিন্তু আপনার নিকট অপরিচিত; এখনও নিজের কি আছে, কি নাই, তাহা জানে না, স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যের কিছু বিকাশ হইয়াছে, আপনার কতক কতক আপনার বলিয়া জানিয়াছে, কিন্তু এখনও সাজাইয়া গোছাইয়া লইতে পারে নাই, কাহার সহিত কি

সম্বন্ধ ঠিক করিতে পারে নাই, এবং বোধ করি আপনার অস্তিত্বের প্রবাহ সম্বন্ধে এখনও আপনি সন্দিহান। জাগ্রদবস্থায় চৈতন্য বিকশিত, স্ফুট, স্ফূর্ত্তিমান; আপনাকে জানে, আপনার সকলকে চিনে; কোন্ অনুভূতিটা কোন্ স্মৃতিকে উদ্বোধিত করিতেছে, কোন্ স্মৃতি কোন্ আকাঙ্খাকে জাগাইতেছে, এবং সে নিজে সেই অনুভূতিটা, স্মৃতিটা, আকাঙ্খাটাকে লইয়া কি করিবে, কোথায় রাখিবে, ইত্যাদি লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। স্থূলভাবে বুঝাইতে হইলে কৃমিকীটের চেতনাকে বোধ করি সুষুপ্ত, মশামাছির চেতনাকে স্বপ্নাবস্থ ও উচ্চতর জীবের চেতনাকে জাগ্রত বলিতে পারা যায়। জোঁকের কাছে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে কি না সন্দেহ; মাছির জগৎ অসম্বদ্ধ, অনিয়মিত, ব্যবস্থাহীন, আর পশুপাখীর জগৎ অনেকাংশে সুবদ্ধ, সুগ্রথিত, সুসংযত, সুব্যবস্থ। বেদান্ত শাস্ত্রে এই শব্দকয়টি যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ঠিক সে অর্থে নাই বা লইলাম।

এইরূপ চেতনার আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি। সে আপনাকে বিশ্লিষ্ট, বিভিন্ন, ছিন্ন করিয়া দুই ভাগে রাখে, একভাগের নাম দেয় আত্মা, অহং বা আমি আর একভাগের নাম দেয় প্রকৃতি অথবা বাহ্য জগৎ। এবং এই দুয়ের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত সম্বন্ধনির্ণয় লইয়া আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়া কৌতুক করে। যে চিৎপদার্থগুলির সমষ্টীকে আপনা হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া ব্যক্ত প্রকৃতি বা বাহ্য জগৎ নাম দেয়, তাহাদিগকে আবার দুই রকমে সাজাইয়া দেখে।

এক রকমে গোছানর নাম দেশব্যাপ্তি, আর এক রকমে গোছানর নাম কালব্যাপ্তি। কতকগুলা এক সঙ্গে দেখে; কতকগুলা পর পর দেখে। অথবা এক রকমে দেখার নাম পর পর দেখা, কালে দেখা, যথাকালে বিন্যস্ত করিয়া দেখা। তৃতীয় কোন রকমে দেখে না, কেন

দেখে না, তাহার উত্তর নাই। সুতরাং দেশ ও কাল এই চেতনার আত্মনিরীক্ষণের রীতিমাত্র। যে অর্থে আমার বাহিরে অন্য জগৎ নাই সেই অর্থে আমার বাহিরে দেশও নাই, আমার বাহিরে কালও নাই। আমিই আমার অনুভূতিগুলিকে আমারই আবিষ্কৃত উপায়ে দেশে স্থাপিত করি ও কালে বিন্যস্ত করি, সব অনুভূতিগুলিকে নহে, কতকগুলিকে মাত্র কেননা, আমার চেতনা এখনও পূর্ণবিকাশ লাভ করে নাই, পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই। সাজান ও গোছানর দিকে আমার প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসেই চেতনার বিকাশ। এই প্রয়াসে শক্তিসঞ্চারের ও শ্রম-সংক্ষেপের প্রবল চেষ্টা। সকল অনুভূতি আমি চিনি না যাহাদিগকে চিনি, তাহাদের মধ্যেও আবার কতকগুলিকে সাজাইবার সময় বাছিয়া লই। সাজাইবার সময় কতকগুলিকে ডাকিয়া লই, কতকগুলিকে অনাদরে পরিত্যাগ করি। আবার মনের মতন করিয়া সাজাই পরস্পর সুসম্বদ্ধ সুনিয়ত একটি শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ রাখিয়া সাজাই। যখন যাহাকে দরকার হয়, তখনি যেন তাহাকে ডাকিয়া পাই যেন ভেরীর আওয়াজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সকলে আপন আপন নির্দিষ্টস্থলে সুসম্বদ্ধ সুবিন্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া যায়, যেন ব্যূহরচনার পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ না হয়। যেন ব্যূহরচনা হইতে হইতেই যুদ্ধে হঠিতে না হয়। কে কাহার সহিত যুদ্ধে হঠিবে? আমাকে আমার প্রক্ষিপ্ত বাহ্যজগতের সহিত কাল্পনিক যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া আমি কৌতুক দেখিতেছি; সেই কল্পিত যুদ্ধে কল্পিত বাহ্যজগতের কাছে আমাকে যেন হঠিতে না হয়। বাহ্যজগৎকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই এবং উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সুবিহিত ব্যবস্থা রাখিয়া সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চেতনার আবিষ্কার এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিতে বা বহির্জগতে নিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেননা, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। নিয়মের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতন্যের শ্রমসংক্ষেপ

চেতনার বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে গতি, আমার কল্পিত জীবনসংগ্রামে জয়লাভের ভরসা। তাই আমি আমার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তাই আমার জগতের নিয়মবলে পৃথিবী ঘুরে, বাতাস বহে, আলো জ্বলে। তাই আমার জগৎ ছন্দোবদ্ধ সুললিত কবিতা, পঠনে প্রাঞ্জল, শ্রবণে মধুবর্ষী।

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চেতনার বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার, সেই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার স্বভাব। যাহা নিয়মের ভিতরে এখনও আইসে নাই, তাহা আমার কেমন কেমন অসঙ্গত ঠেকে, তাহাকে দৈব বলি, অতিপ্রাকৃত বলি, মিরাকল বলি। তাহার জন্য ভূতপ্রেত পিশাচের, দেবতা-উপদেবতার কল্পনা করি। তাহার জন্য আমাছাড়া জগৎছাড়া সৃষ্টিছাড়া একজন সৃষ্টি-কর্ত্তার ও বিধাতার কল্পনা করি।

যাহাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি না তাহাকে নিয়মের অধীনতায় আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা। সর্ব্বত্র যে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা নহে, তবে ইহার সফলতা ধরিয়া আমার আত্মবিকাশের পরিমাণ। ইহারই নাম বিজ্ঞানচর্চ্চা,—যাহার ফলে জ্ঞানের উন্নতি বা বিকাশ। আমার জগতে আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; ক্ষুধা পাইলে আমি খাই, ঘুম পাইলে ঘুমাই ও আমার জগতে অহোরাত্র পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। ঐ ব্যক্তি, যাহাকে পাগল বলা যায়, উহার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ও ব্যক্তি ক্ষুধা পাইলে খায় না এবং উহার নিকট বোধ করি, দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন ঘটে না। উহারও একটা জগৎ আছে; কিন্তু সেটা আমার জগতের মত সুনিয়ত সুব্যবস্থ নহে; সে জগৎটা এলোমেলো অসংযত অযথান্যস্ত।

প্রকৃতি যেমন আমারই অন্তরে, প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি

তেমনি আমারই অন্তরে, এবং প্রকৃতিতে নিয়মের শৃঙ্খলা তেমনি আমারই সৃষ্টি। জগৎ অনন্ত, এ কথা অর্থহীন, কাল অনাদি, এ কথা অর্থহীন, দেশ অসীম, এ কথাও অর্থহীন। আমার জগৎ শান্ত; যেটুকু আমি যখন দেখিতেছি, সেইটুকুই তখন অস্তিত্ববান্, তাহা ছাড়িয়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। আমার কালও সাদি ও সান্ত; যে টুকুর সহিত আমার পরিচয়, সেই টুকুই অস্তিত্ববান্। অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার; উহা কাব্যে শোভা পায়; বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই আমার আত্মবিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও দূরে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহার আত্মা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও সামর্থ্য-বান। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা নাই, সে বাতুল বা পাগল।

আমার নিজের এই অভিব্যক্তির নাম জগতের সৃষ্টি। মানবের জ্ঞান আর দ্বিতীয় সৃষ্টির বিষয় অবগত নহে।

প্রলয়

বাল্যকালে একদিন পিতামহীর নিকট শুনিতে পাই, পৃথিবী এক সময়ে উল্‌টাইয়া যাইবে। সে দিন ভাল নিদ্রা হইয়াছিল কি না স্মরণ নাই। মনের ভিতব প্রবল বিভীষিকার সঞ্চাব হইয়াছিল, এইটুকু স্মরণ আছে। পরদিন পাঠশালাব একটি প্রবীণতর বন্ধু আশ্বাস দেন পৃথিবী উল্‌টাইবে সন্দেহ নাই, তবে এখনও তাহাতে লক্ষ বৎসব বিলম্ব আছে। এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উল্‌টান অপেক্ষা পণ্ডিত মহাশয়েব বর্ত্তমান সামীপ্য অধিক উদ্বেগের কাবণ নির্দ্ধারিত কবিয়াছিলাম।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রলয়তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। ফলে পিতামহী ঠাকুরাণীর উক্তিব সহিত বন্ধুর আশ্বাসবাণী যোগ করিলে যে কয়টি কথা হয়, তাহাব অধিক বিজ্ঞানশাস্ত্রেও কিছু বলেন না। প্রলয় একদিন ঘটিবে সন্দেহ নাই; তবে এখনও বিলম্ব আছে।

বিজ্ঞানেব পুঁথিমধ্যে নানা সদুত্তর পাওয়া যায়। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড সকলের কথার সামঞ্জস্য কবিয়া বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর ধ্বংস হইবে ঠিক, তবে গবমে হইবে কি ঠাণ্ডায় হইবে বলা যায় না'। অধ্যাপক জেবনস বিজ্ঞানেব কথা বিশেব ভাবে সমালোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, 'পৃথিবীব ধ্বংস হইবে সন্দেহ নাই, লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে হইবারই সম্ভব, তবে এই মুহূর্ত্তেই যে হইবে না, তাহাও বলা যায় না'।

এমন সদুত্তর আর কি হইতে পারে! ইহাতে পাঠকের তৃপ্তি হউক আর না হউক, পাঁচ জন পণ্ডিতে এ সম্বন্ধে পাঁচ কথা বলেন, তাহাই এ প্রবন্ধে উপস্থিত করিব।

আমরা পৃথিবীর অধিবাসী, অতএব অন্য লোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথাই আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূমণ্ডলটা যদি কিছুদিনের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে গ্ল্যাডষ্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থাবলম্বনের পরিবর্ত্তে আইরিশ হোমরূল লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই।

প্রথম কথা এই। আমাদের পৃথিবী সৌরজগৎরূপ একটি পরিবারের অন্তর্গত। সূর্য্যমণ্ডলকে মধ্যে রাখিয়া যে কয়টি ছোট বড় গ্রহ বহুকাল হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পৃথিবী তন্মধ্যে অন্য-তম। সূর্য্যমণ্ডলের প্রবল আকর্ষণে ইহারা সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, কিন্তু ইঁহাদের পরস্পর আকর্ষণে কেহই একটা নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় ঘুরিতে পারে না। পৃথিবীও সেই জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথে ঘুরিতে পায় না, সর্ব্বদাই সূর্য্য কর্ষণনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে একটু না একটু ভ্রষ্ট হইয়া চলিয়া থাকে। এখন প্রশ্ন এই, এই নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ভ্রংশ বা কক্ষচ্যুতি বশতঃ এমন সময় কি আসিতে পারে না, যখন দুইটা গ্রহ অকস্মাৎ এক সময়ে এক জায়গায় উপস্থিত হইয়া পরস্পর সংঘটে চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে?

উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। নিউটন দুইটা পদার্থের মধ্যে আকর্ষণের নিয়ম বাহির করিয়া ভবিষ্যৎ পণ্ডিতবর্গের মস্তকে একটা প্রকাণ্ড বোঝা চাপাইয়া অব্যাহতি পান। জগতের মধ্যে দুইটামাত্র পদার্থ থাকিলে কোন্‌টা কখন কোথায় যাইবে, স্থির করিতে কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জগতে খণ্ডপদার্থের সংখ্যা দুইয়ের

অনেক অধিক। তিনটা পদার্থ পরস্পরকে নিউটনের নিয়মে আকর্ষণ করিতে থাকিলে কখন কোন্‌টা কোন্ খানে থাকিবে স্থির করিতে গণিতজ্ঞদের জীবনীশক্তি ওষ্ঠপ্রান্তে আইসে। চারিটা পদার্থ লইয়া স্থির করিতে গেলে, সমস্যা বিভ্রাট্ হইয়া দাঁড়ায়। সমস্যা দুরূহ সন্দেহ নাই, তথাপি লাপ্লাস এই সমস্যাপূরণে কতকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। লাপ্লাস প্রতিপন্ন করেন, পরস্পরের আকর্ষণে গ্রহগণের চিরস্থায়ী কক্ষাচ্যুতির কোনরূপ আশঙ্কা নাই। সূত্রলম্বিত পেণ্ডুলম বা পরিদোলক যেমন স্বস্থান হইতে একেবারে ভ্রষ্ট হয় না, কেবল সেই স্থানকে লক্ষ্য করিয়া একটু এদিক্ ওদিক্ দুলিতে থাকে বা নড়িতে থাকে; সেইরূপ প্রত্যেক গ্রহ সহচরদের আকর্ষণফলে আপন পথ হইতে ইতস্ততঃ একটু বিচলিত হয় মাত্র; ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নির্দ্দিষ্ট পথের দিকেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। সৌরজগতের মধ্যে এমন বল কিছুই বর্ত্তমান নাই, যাহাতে চিরকালের মত কোন গ্রহের রাস্তা বদলাইতে পারে। সুতরাং সৌরজগতের মধ্যে গ্রহে গ্রহে ঠোকাঠুকি হইয়া মহা প্রলয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

লাপ্লাস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। পরবর্ত্তী গণিতজ্ঞেরা লাপ্লাসের যুক্তির অভ্যন্তরে কোন ভ্রান্তি ধরিতে পারেন নাই। এমন কি কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত হুইওয়েল সাহেব লাপ্লাসের এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন, দেখ বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল; সৌরজগতের মত এমন জটিল যন্ত্রের মধ্যে এমন সুনিয়ত শৃঙ্খলা যে, সেই যন্ত্র কখনও বিকল হইবার সম্ভাবনা নাই, মা ভৈঃ, মানব, মা ভৈঃ; সৌরজগতের ধ্বংস নাই'।

লাপ্লাসের গণনায় প্রমাদ নাই সত্য, কিন্তু আর একটা উপদ্রবের

সম্ভাবনা আছে। সুন্দর সুনিয়মিত সৌরজগতের মধ্যে কোথা হইতে মাঝে মাঝে ভীমপুচ্ছধারী অজ্ঞাতকুলশীল ধূমকেতু একটা আইসে, তাহাদের দেখিলে অদ্যাপি পণ্ডিতগণেরও মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ধূমকেতুর উদয়ে মহামারী বা রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কায় কাঁসর ঘণ্টা বাজান লোকে আর আবশ্যক বোধ না করিতে পারে, কিন্তু ইহাদের স্থিতি গতি আকার অবয়ব এমনি রহস্যপূর্ণ যে, একটু আতঙ্ক না হইয়াও যায় না। মাধ্যাকর্ষণ অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ধূমকেতুকেও অধীন রাখিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা কোথায় থাকে, কোথা হইতে আসে কিছুই যখন জানা নাই, তখন কোন অজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য স্থান হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া মাধ্যাকর্ষণের বলেই আমাদের নিকটে আসিয়া পৃথিবীকে একটা ধাক্কা দিয়া ফেলিলে পণ্ডিতেরা তর্ক করিবার অবসর না পাইতেও পারেন। আজকাল এ আশঙ্কা কতকটা নিরাকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। ধূমকেতুর আকার, আয়তন যতই ভয়াবহ হউক, উহারা বড়ই লঘুপ্রকৃতির, অর্থাৎ কি না আয়তনে যে ধূমকেতু দশটা পৃথিবীর সমান, ওজনে হয়ত সে দশ ছটাকও নহে। সুতরাং দশটা পৃথিবী কেন, দশহাজারটা সূর্য্যের সমান আয়তন হইলেও ধূমকেতুর ধাক্কা ভয়ানক না হইতেও পারে। আবার এরূপও শুনা যায় যে ইতিমধ্যে আমরা অজ্ঞাতসারে দু একটা ধূমকেতুর অভ্যন্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছি, তখন কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় উল্কাবৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন উৎপাত লক্ষিত হয় নাই। আজকাল অনেকেই সন্দেহ করেন ধূমকেতু উল্কাপিণ্ডের পালমাত্র। একবার একটা ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের সন্নিহিত হইয়াছিল। বৃহস্পতির তাহাতে কিছুই হয় নাই। ধূমকেতুরই গমন পথ বিচলিত হইয়াছিল মাত্র।

ধূমকেতুর সংঘট্টের আশঙ্কা না থাকিলেও সৌরজগতের বাহির

হইতে অন্য কেহ আসিয়া যে পৃথিবীর উপর নিপতিত না হইতে পারে ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। লাপ্লাসের গণনা সৌরজগতের অভ্যন্তরেই বর্ত্তে, বাহিরের কোন পদার্থের উপর বর্ত্তে না। বাহির হইতে কোন পদার্থ কোন কালে আসিয়া আকস্মিক প্রলয় উৎপাদন করিতে পারে না, সাহস করিয়া বলা যায় না। নক্ষত্র-লোকে বরং এইরূপ আকস্মিক প্রলয় ব্যাপারের দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায়। মাঝে মাঝে একটা তারকাকে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিতে দেখা যায়। হগিন্স একটা জ্বলন্ত তারার আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, হঠাৎ হাইড্রোজেন অর্থাৎ উদ্‌জান বাষ্প জ্বলিয়া উঠায় ঐরূপ ঘটিয়াছে। হাইড্রোজেন পোড়াইলে অবশ্য জল হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন পুড়িবার সময় এত উত্তাপ জন্মে যে, তাহার ক্ষুদ্র শিখাতে লোহার পাত পর্য্যন্ত কাগজের মত পুড়িতে পারে। দূরের একটা তারকায় হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠা সামান্য কাণ্ড নহে। পৃথিবীর ইতিহাসেও বোধ করি এইরূপ ঘটনা একবার ঘটিয়াছিল। আজকাল বায়ুর মধ্যে উদ্‌জান বর্ত্তমান নাই, কিন্তু এককালে যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। অবশ্য এক সময়ে সেই সমুদয় উদ্‌জান পুড়িয়া যায়; তাহার ফলে সমুদ্রের উৎপত্তি। আর এক্ষণে উদ্‌জানের অবশেষ পুড়িতে নাই, সে আশঙ্কাও নাই, উদ্‌জান ভিন্ন অন্য পদার্থও এত পরিমাণে বর্ত্তমান নাই, যাহা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া একটা প্রলয় ব্যাপার ঘটাইতে পারে। দহনাদি রাসায়নিক ক্রিয়া ভূমণ্ডলে এখনও না চলিতেছে এমন নহে। তবে তাহা এত ধীরে-সুস্থে সম্পন্ন হইতেছে যে, তাহাতে বিশেষ আশঙ্কা নাই, তবে ভূমিকম্পরূপে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গমরূপে প্রাদেশিক উৎপাত সময়ে সময়ে ঘটায় বটে। হগিন্স যে তারা জ্বলিয়া উঠা দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ ঘটনা আরও কয়েকবার

দেখা গিয়াছে। এই সেদিনই উত্তরাকাশে অরিগানামক নক্ষত্রপুঞ্জের সমীপে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব তারকা কিছুদিন ধরিয়া দীপ্তিসহকারে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এই আকস্মিক দীপ্তির কারণ নির্ণীত হইয়াছে ঠিক্ বলা যায় না। সর্ব্বত্রই যে আভ্যন্তরীণ কারণে তারা জ্বলিয়া উঠে, এমন না হইতে পারে। লকিয়ারের অনুমান দুইটা বিশাল উল্কাপাতের সংঘট্টে অরিগায় ঐরূপ ঘটিয়াছিল।

আর একটা কথা আছে। পৃথিবী আপন অন্তঃস্থ শক্তির বলে হঠাৎ ফাটিয়া শতখণ্ড হইতে পারে কি না? ভূমণ্ডলের অন্তর্ভাগ এখনও বিষম তপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। এত তপ্ত যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর দ্রব অবস্থাপন্ন বলিয়াই এতকাল সকলের সংস্কার ছিল। লর্ড কেলবিন দেখাইয়াছেন, ভূগর্ভ যতই তপ্ত হউক না কেন, উপরের ভূপৃষ্ঠের চাপ এত অধিক যে অভ্যন্তর ভাগ দ্রব অবস্থায় থাকিতে পারে না। দ্রব অবস্থায় যে নাই, তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়। সমুদ্রে যেমন চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণগুণে জোয়ার ভাটার আন্দোলন অবিরত হইতেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তর দ্রব হইলে সেখানেও সেইরূপ আন্দোলন সর্ব্বদা চলিত। ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীর পক্ষে সে ব্যাপারটা বড় সন্তোষজনক হইত না। সেরূপ আন্দোলন নাই দেখিয়া কেলবিন অনুমান করেন, ভূগর্ভ অন্ততঃ ইস্পাতের মত কঠিন।

পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগটা অবশ্য এককালে তরল অবস্থায় ছিল বিশ্বাস করিতে হয়। কতদিন তারল্য গিয়া কাঠিন্যে দাঁড়াইয়াছে, তাহাও গণিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ ক্রমে শীতল ও কঠিন, বন্ধুর ও উচুনীচু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে ফাট আছে। গর্ভস্থ তপ্ত পদার্থ কখন কখন সেই ফাট দিয়া প্রবল বেগে বাহির হইয়া পড়ে। তখন একটা প্রচণ্ড কাণ্ড ঘটে; ইহারই

নাম অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাৎ। সেদিন ১৮৮২ সালের ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতে যে সকল পদার্থ ভূগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্তরীক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা বহুবৎসর ধরিয়া বায়ুরাশিতে ভাসিয়াছিল। হিসাবে দেখা যায়, কোন পদার্থ সেকেণ্ডে আটমাইল বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, তাহা আর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসে না। হয়ত পুরাকালে কোন প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে পৃথিবীর দুই এক টুক্‌রা চিরকালের মত পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সার রবার্ট বল সাহেবের মতে এইরূপে অনেক উল্কা-পিণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক, পৃথিবীর অন্তঃস্থ শক্তি এখন যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ক্রাকাটোয়ার ব্যাপারের মত একটা ছোটখাট প্রাদেশিক প্রলয় ঘটাইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে একটা মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা আছে বোধ হয় না। একটা প্রকাণ্ড অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া পৃথিবী যে দ্বিধা বা সহস্রধা ভগ্ন হইয়া যাইবে, সেরূপ আশঙ্কা নাই।

লাপ্লাস গ্রহগণের কক্ষাচ্যুতির একটা প্রবল কারণ গণনার মধ্যে ধরেন নাই। লর্ড কেলবিন স্বয়ং তৎপথানুবর্ত্তী। জর্জ্জ ডারুইন এ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। চন্দ্রমণ্ডল সমুদ্রের জলরাশিকে প্রত্যহ পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ফলে পৃথিবীর আবর্ত্তনের বেগ ক্রমে একটু করিয়া কমিতেছে ও চন্দ্রের দূরত্বও একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এমন দিন ছিল যখন চন্দ্র-মণ্ডল আমাদের আরও নিকটে ছিল। এমন সময় আসিবে যখন চন্দ্র আরও দূরে যাইবে। এখন চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার আবর্ত্তিত হয়; তখন এগারশ কি বারশ ঘণ্টায় পৃথিবী আবর্ত্তন করিবে। এখন ছোট দিনের প্রায় তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর হয়; তখন সেই বড় বড় দিনের সাত দিন কি আট দিনে বৎসর হইবে। মনুষ্যজাতিকে সে

পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কি না জানি না ; কিন্তু ঘটনাটা অনিবার্য্য।

যে কারণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে দূরে যাইতেছে, ঠিক সেই কারণে পৃথিবীও সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইবে। পৃথিবীর কক্ষাচ্যুতির এই একটা কারণ। ইহার ফলনির্দ্দেশ বাহুল্য।

আর একটা কথা। আকাশ যে সর্ব্বতোভাবে শূন্য নহে, তাহা স্থির। আলোকবাহী ও তাড়িততরঙ্গবাহী ঈথর নামক পদার্থ সমগ্র শূন্যদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী সেই ঈথর ঠেলিয়া স্বীয় মার্গে ভ্রমণ করিতেছে। জল কিংবা বায়ু পদার্থের গমনে বাধা দেয়, ঈথর অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইলেও কিছুমাত্র বাধা দেয় কি না তাহার প্রমাণ আবশ্যক। ঈথরের সেই ক্ষমতা আছে কি না, টেট্ সাহেব অনেক চেষ্টায় তাহার প্রমাণ পান নাই। এন্‌কি সাহেবের আবিষ্কৃত ধূমকেতুর কক্ষাচ্যুতি ঈথরের বাধা ভিন্ন অন্য কারণেও সম্ভব। সম্প্রতি অনেকে সাধারণ জড়পদার্থের সহিত ঈথরের সম্বন্ধ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছেন। ঈথর ঠেলিয়া চলিবার সময় গ্রহ উপগ্রহ কোনরূপ বাধা পায়, তাহা প্রতিপাদনে এখনও কেহ সমর্থ হন নাই।

লর্ড কেলবিন একটা প্রকাণ্ড তথ্যের আবিষ্কর্ত্তা। ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে, জাগতিক শক্তির অপচয়। সম্প্রতি শক্তি, জগতে নানা মূর্ত্তিতে বিদ্যমান। কিন্তু শক্তি অপোচয়োন্মুখী। শক্তিমাত্র আপনা হইতে সর্ব্বত্র তাপরূপে পরিণত হয়। ফলে এমন দিন আসিবে, যখন শক্তি আর প্রকারভেদ থাকিবে না। সমস্ত শক্তি সর্ব্বত্র সমোষ্ণ তাপে পরিণত হইলে জগদ্‌যন্ত্রের চলাচল বন্ধ হইবে। গ্রহ উপগ্রহ গতিরহিত হইয়া সূর্য্যের সহিত মিলিত হইবে। ব্রহ্মাণ্ড গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন, তপ্ত অথবা শীতল, একটা অথবা কতিপয়, বৃহৎ পিণ্ডের

আকার ধারণ করিবে। এই পরিণাম নিবারণ করিতে পারে, এমন উপায় এখন কিছু দেখা যায় না। যদি তত দিন ধরিয়া বর্ত্তমান নিয়মের অধীনতায় জগৎ চলে, তবে এই পরিণাম অনিবার্য্য। এই পরিণামকে প্রলয় বলিতে পার।

হেলমহোলৎজ একটা মস্ত কথা বলিয়াছেন। সূর্য্য আমাদের জীবন-শক্তির মূলে। সূর্য্যমণ্ডল প্রভূত পরিমাণে তাপরশ্মি বিকিরণ করিতেছে। তাহার কণিকামাত্র লইয়া আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতিবিধি। সূর্য্য-মণ্ডলে যতই তাপ জন্মিতেছে আর বাহির হইয়া যাইতেছে, সূর্য্যমণ্ডল ততই আয়তনে সঙ্কীর্ণ হইতেছে। সূর্য্যের পরিধি বৎসরে প্রায় আশী হাত খাট হইতেছে। দু'দশহাজার বৎসরে আমরা অবশ্য তাহা টের পাই না, কিন্তু অর্দ্ধকোটি বৎসরের মধ্যে সূর্য্যের আকার বর্ত্তমানের আট ভাগ অর্থাৎ দুই আনা মাত্র দাঁড়াইবে। এমন দিন আসিবে যখন ভাস্কর প্রভাহীন হইবেন। গগন-প্রদেশ অনুসন্ধান করিয়া এমন নির্ব্বাপিত সূর্য্যমণ্ডল দুই একটার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সূর্য্যের সেই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। তাহার বহু পূর্ব্বে পৃথিবী জীবশূন্য হইবে বলা বাহুল্যমাত্র।

প্রলয়সম্বন্ধে বিজ্ঞানের এইরূপ উক্তি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার হুইওয়েল তদানীন্তন বিজ্ঞানের মুখপাত্রস্বরূপ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ভয় নাই'। পঞ্চাশ বৎসর পরে পণ্ডিতমণ্ডলী একরকম একবাক্যে বলিতে-ছেন, ভরসাও নাই'। বলা উচিত, প্রলয় শব্দ এখানে কোন দার্শনিক অর্থে প্রয়োগ করি নাই।

ক্লিফোর্ডের কীট

এতদিন আমরা ভাল ছিলাম ; অন্ততঃ মনের শান্তি ছিল। ব্যাঘ্রাদি জন্তু মধ্যে মধ্যে লোকালয়ে পদার্পণ করিয়া আমাদের দুই চারিটাকে উদরগত করে এবং বিছানার নীচ হইতে সাপ বাহির হইয়া সহসা আমাদিগকে যমালয়ে পাঠাইয়া দেয় ; কিন্তু সভ্যতার বিস্তারে ইহাদের প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। সাপ বাঘের ভয় কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখন জলের গেলাস মুখে তুলিলেই মনে হয়, এই বুঝি জীবলীলা শেষ হইল, কোন্ বাসিলস্ অজ্ঞাতসারে দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বস্তুতঃ আমাদের এই নবপরিচিত ক্ষুদ্র জ্ঞাতি-গণের বংশবিস্তার ও পরাক্রম দেখিয়া বোধ হয়, আমরা যে বাঁচিয়া আছি, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কিছুই হইতে পারে না। আমরা যে অদ্যাপি সগর্ব্বে পদক্ষেপে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত করিতেছি, সে বাসিলস্‌গণের অসামান্য সহিষ্ণুতার পরিচয় ও 'জলন্ত ত্যাগস্বীকারের' পরাকাষ্ঠা বলিতে হইবে। প্রকৃতি-মাতার বহুযত্নে লালিত ও বহুযুগের প্রয়াসে গঠিত ও পুষ্ট মানুষের এই সুন্দর তনুখানি এত সহজে বাক্‌টিরিয়া কর্ত্তৃক অঙ্গারায় বায়ুতে পরিণত হইতে দেখিয়া প্রকৃতি-মাতা কাঁদেন কি হাসেন বলিতে পারি না, আমাদের কিন্তু এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিশেষ আনন্দের কারণ নাই।

ইহাকেও পারা যায়। কিন্তু মানুষের বহু যত্নের ধন জাগতিক রহস্যের তথ্যগুলিরও অবস্থা বিপৎসঙ্কুল দেখিলে মনে আর শান্তি থাকে না। যেগুলিকে সনাতন সত্য বলিয়া জানিয়া আসিয়া, বহুযুগের পর্য্যবেক্ষণ ফলে মানুষ যে সকল সত্যের আবিষ্কার করিয়াছে, যখন দেখা যায়, সেই সত্যগুলিও অবিনাশী নহে, মানুষের ক্ষণভঙ্গুর

দেহের ন্যায় নশ্বর; মানুষ তাহাদের আবিষ্কার করে নাই, সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, এবং অপরাপর সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাহাদেরও বিনাশাশঙ্কা বর্ত্তমান; তখন আর শান্তি থাকিবে কিরূপে?

আকাশ অসীম, এই একটা মানুষের চিরপরিচিত সত্য। ইংরেজিতে যাহাকে space বলে, সেই অর্থে আকাশ বলিতেছি। এখানে আকাশ অর্থে কেহ যেন শূন্যব্যাপী আলোকবাহী ঈথর না বুঝেন। এই সত্যটার সম্বন্ধে কাহারও কখনও সংশয় ছিল না। আকাশের কি আবার সীমা আছে? আকাশের আবার পরিধি আছে? এও কি কখনও হয়? অত বড় মনীষী ইমানুয়েল ক্যাণ্ট, যিনি মানুষের নানাবিধ দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিমূলে সবলে আঘাত করিয়া গিয়াছেন, এই সংস্কারটাকে আক্রমণ করিতে তাঁহারও সাহস হয় নাই। আকাশের অসীমতা লইয়া আমরাই কত দীর্ঘচ্ছন্দ ভাবগম্ভীর বক্তৃতা করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, এই সত্যটার শরীরেও বাসিলস্ ধরিয়াছে। এই বাসিলস্ ক্লিফোর্ডের কীট।

ক্লিফোর্ডের কীট কেহ কখনও দেখে নাই, কেহ কখন দেখিবেও না, অণুবীক্ষণযন্ত্র এখানে পরাস্ত। এই কীট মানুষের জাতি-মধ্যে গণ্য নহে; সুতরাং জীবতত্ত্ববিদেরা ইহার জাতিকুল নিরূপণে অসমর্থ। অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের কল্পনাকে ইহার জননী না বলিলেও ধাত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার আকৃতি কিছু অদ্ভুত গোছের। এত বড় হাতীটা হইতে অত ছোট জীবাণু পর্য্যন্ত সকলেরই শরীরের দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার আছে, বেধ আছে, ইহার কেবল আছে দৈর্ঘ্য, বিস্তার নাই, বেধও নাই। জ্যামিতি শাস্ত্রে বিস্তার-বেধ-বিহীন দৈর্ঘ্যমাত্রময় রেখানামক পদার্থের কল্পনা আছে। ক্লিফোর্ডের কীটের শরীর ক্ষুদ্র একটু রেখামাত্র ইহার লীলাভূমিও ইহার শরীরের অনুরূপ। আমরা যেমন দৈর্ঘ্য-

বিস্তার-বেধময় ত্রিগুণ জগতে বিচরণ করি, এও তেমনি স্বচ্ছন্দে দৈর্ঘ্য-মাত্রসার একটি বৃত্তপথে চলিয়া বেড়ায়। সেই বৃত্তটি অথবা সেই বৃত্তের পরিধিটাই তাহার জগৎ। সেই বিস্তারহীন জগতে তাহার বিস্তারহীন শরীর লইয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। হইতে পারে তাহার অনুভবশক্তি বুদ্ধিশক্তি ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি মানুষেরই মত; কিন্তু তাহার সমুদয় জ্ঞান সেই ক্ষুদ্র বৃত্তিপরিধিতেই সীমাবদ্ধ। তাহার বৃত্তপথের অর্থাৎ তাহার নিজ জগতের বাহিরে যে আর একটা বিশালতর জগৎ আছে, যাহাতে চন্দ্র সূর্য্য নির্দিষ্ট বিধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহাতে বাক্‌টিরিয়া নামক জীবের বংশবৃদ্ধির জন্য মনুষ্যনামক জীব অবস্থান করিতেছে, সে জগতের কোন সংবাদ সে রাখে না; সেই জগতের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানপ্রাপ্তির তাহার উপায় নাই। কিরূপেই বা সে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবে? তাহার শরীর, তাহার ইন্দ্রিয়, তাহার মনোবৃত্তি সমুদয়ই তাহার আপন রেখাময় জগতের অনুরূপ। বহিঃস্থ বৃহত্তর জগতের সম্বন্ধে জ্ঞানের আহরণোপযোগী কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার নাই, সেরূপ কোন ইন্দ্রিয় তাহার থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু সে নিজের জগতের প্রভু। সেইখানে মনের আনন্দে সে এদিকে ওদিকে অথবা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচরণ করে, স্বজাতীয় কীটদের সহিত আহার ব্যবহার করে, এবং চির জীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ বিহারভূমির শেষ সীমা না পাইয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে সিদ্ধান্ত করে, যে তাহার জগতের সীমা নাই।

ক্লিফোর্ডের কীটের এই স্থির সিদ্ধান্তে আমাদের হাসিবার অধিকার আছে; কিন্তু হাসির সঙ্গে আমাদের একটু শিক্ষালাভও হইতে পারে। আরব্য উপন্যাসের বিখ্যাত পিশাচ বুদ্ধিবিষয়ে যেমনই হউক, ক্ষমতাবিষয়ে বড় যে সে ছিল না; আপনার অত বড় শরীরটা ইচ্ছামাত্রে সঙ্কীর্ণ করিয়া

ছোট কুপীর ভিতর পুরিয়াছিল। কিন্তু সেও আপনার দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধযুক্ত শরীরটাকে কেবল দৈর্ঘ্যমাত্রে পরিণত করিয়া একটি ইউক্লিডের রেখার ভিতর পুরিতে পারিত কি না সন্দেহের বিষয়। আমাদের ত কথাই নাই। যাহা হউক আমরা রেখার ভিতর বাস করিতে না পারি, রেখার কল্পনা করিতে পারি, শুধু রেখা কেন, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এই দুই গুণযুক্ত অর্থাৎ দ্বিধা বিস্তৃত স্থান,—যেমন কোন বস্তুর পিট অথবা তল,—তাহারও কল্পনা করিতে পারি। ইউক্লিডের প্রসাদে স্কুলের ছাত্রমাত্রেই এই দুই কল্পনায় পটু। দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ এই তিন গুণযুক্ত অর্থাৎ ত্রিধা বিস্তৃত দেশ,—তাহার কল্পনার প্রয়োজন নাই,—সেরূপ দেশে ত আমরা বাসই করিতেছি।

আমরা যাহাকে আকাশ বলি, যে আকাশের একটু না একটু অংশ ব্যাপিয়া আমাদের শরীর অবস্থিত ও আমাদের জ্ঞানগোচর পদার্থমাত্রই অবস্থিত, তাহাই এই তিন গুণযুক্ত ত্রিধা বিস্তৃত দেশ। কিন্তু এই তিন গুণের অধিক চতুর্থ গুণ আমরা বুঝি না। তিন দিকে প্রসারিত ব্যতীত চারিদিকে প্রসারিত—চতুর্ধা বিস্তৃত—দেশ আমাদের কল্পনাতেই আসে না। দৈর্ঘ্যময় রেখা কল্পনায় আসে, দৈর্ঘ্যবিস্তারময় তল কল্পনায় আসে, দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধময় দেশ ত আমাদেরই বাসভূমি। কিন্তু দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ ব্যতীত আরও একটা পৃথক্ গুণযুক্ত দেশ থাকিতে পারে, আমাদের জগৎটার চেয়ে আরও একটা প্রশস্ততর জগৎ থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আমাদের নাই, সেরূপ জ্ঞান লাভের কোন উপায়ই নাই, সে আমাদের কল্পনার অতীত। কল্পনার অতীত বটে! কিন্তু সেরূপ জগৎ নাই, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? ক্লিফোর্ডের কীটও ত আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জগতের অস্তিত্ব, কল্পনা করিতে পারে না।

যাহা তাহার জ্ঞানসীমার ভিতরে, তাহাই তাহার কল্পনার আয়ত্ত ; যাহা তাহার জ্ঞানের সীমাব বাহিরে, তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। কে জানে যে আমাদের অবস্থা ক্লিফোর্ডের কীটের মত নহে ? কে বলিতে পারে আমাদের জগৎ আর একটা ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, ভিন্ন নিয়মে চালিত, ভিন্নজীবাধ্যুষিত, বৃহত্তর জগতের ভিতরে নিহিত নয় ? কে বলিতে পারে যে আমরাও ক্লিফোর্ডের কীটের মত নিজ সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পরিধিযুক্ত, ক্ষুদ্র জগতে বাস করিতেছি না, এবং আমাদের সীমাবদ্ধ মনোবৃত্তিব প্রকাশস্থল, এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বিষয় সসীম জগৎকে অসীম ভাবিয়া আস্ফালন করিতেছি না ? আমরা ইহাব সীমা পাই নাই বলিয়া, এ জগতের সীমা নাই, এ কিরূপ বিচাব ?

ক্লিফোর্ডের কীটের অবস্থা ভাবিলে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা-গুলির-স্বতঃসিদ্ধতা সম্বন্ধে ঘোব সংশয় আসিয়া পড়ে। এই স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের জ্ঞানায়ত্ত আকাশের ধর্ম্মসম্বন্ধে, আমাদের উপার্জ্জিত সিদ্ধান্তমাত্র। আমাদের আকাশের যতটুকু আমবা দেখিতে পাই, এই আকাশের যতদূর পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানেব ভিতরে আসে ততটুকুতেই এই ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমান ; এবং আমরা যতদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছি, অতীতের যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে পাইতেছি, ততদিন এই ধর্ম্মগুলির কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই, এই পর্য্যন্ত আমরা সাহস কবিয়া বলিতে পারি ; আকাশের সর্ব্বত্র এই ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে অথবা এই ধর্ম্মগুলি চিরকাল ধবিয়া এইরূপ অপবিচিত ভাবে রহিয়াছে ; এতদূর বলাও মানুষেব পক্ষে প্রগল্‌ভতা।

রুশায় পণ্ডিত লবাচুস্কী ইউক্লিডেব স্বতঃসিদ্ধগুলি বর্জ্জন করিয়া নূতন জ্যামিতি-শাস্ত্র গঠন করেন। জর্ম্মনির রাইমান ও হেল-মহোলৎজ তৎপরে এই সংশয়বাদ প্রচার করিয়াছেন, লণ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক ক্লিফোর্ড ইংলণ্ডে এই মতের বিস্তার করেন। ক্লিফোর্ডের অকালমৃত্যু না হইলে আমরা আরও অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইতাম।

মাধ্যাকর্ষণ

নিউটন একদিন আপেল ফলভূমিতে পড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে। অমনি মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব বাহির হইল ও নিউটনের নাম ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া গেল। এবং তদবধি আপেল ফল কেন পড়ে, জিজ্ঞাসা করিলেই প্রত্যেক পাঠশালার বালক উত্তর দেয়, মাধ্যাকর্ষণই উহার কারণ।

গল্পটা কতদূর সত্য, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। গল্পটা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আপেল ফল যে কেন ভূমিতে পড়ে, তাহার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বোধ করি কাহারও আর সন্দেহ নাই।

মানুষের মন সর্ব্বদাই কারণ অনুসন্ধান করিতে চায়, এবং শুনা যায়, এইজন্যই জীবসমাজে মানুষের স্থান এত উচ্চে। কিন্তু সেই কারণ-অনুসন্ধানস্পৃহাটা যদি এত সহজে পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, জীবসমাজে শ্রেণিবিভাগ কার্য্যটার এখনও পুনঃ সংস্করণ আবশ্যক, মনুষ্যকে অত উচ্চে তুলিলে চলিবে না।

নিউটনের বহুপূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য অথবা অন্য কোন পণ্ডিত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা সগর্ব্বে সংস্কৃত শ্লোকের প্রমাণ আওড়ান, তাঁহাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, ভাস্করাচার্য্যই কি আর নিউটনই কি, কোন পণ্ডিতই পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির অস্তিত্ব নূতন আবিষ্কার করেন নাই। নিউটনের ও ভাস্করের বহুপূর্ব্বে এই আকর্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যে জম্বুক আঙ্গুরের প্রত্যাশায় ঊর্দ্ধমুখে অপেক্ষা করিয়াছিল, সেও জানিত, যে আঙ্গুর ফল পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। অপিচ, আমার এই উক্তিতে নিউটনের ও ভাস্করের মহিমান্বিত যশোরাশির কণিকামাত্র অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, আপেল ফল যে কি কারণে ভূপতিত হয়, এ পর্য্যন্ত তাহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

নিউটন আপেল ফলের ভূপতনের কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, তবে তিনি যে একটা প্রকাণ্ড কর্ম্ম সাধনা করিয়া গিয়াছেন, সেটার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত।

আপেল ফল যে বৃন্তচ্যুত হইলেই পৃথিবীর দিকে দৌড়ায়, ইহা নিউটন যেমন দেখিয়াছিলেন, মনুষ্য হইতে জম্বুক পর্য্যন্ত সকলেই তাহা চিরকাল ধরিয়া দেখিবা আসিতেছে। কিন্তু এই ঘটনাব মূলে আপেলের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ আছে, অথবা পৃথিবীব প্রতি আপেলের অনুরাগ আছে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না।

ফলে বৃন্তচ্যুত আপেল ফল, আপন প্রেমভরেই হউক বা মেদিনীর আকর্ষণবলেই হউক, চিরকালই মেদিনীর প্রতি ধাইতেছে। এবং শুধু আপেল ফল কেন, গগনবিহারী শশধব স্বয়ং এই আকর্ষণরজ্জুতে বাঁধা রহিয়া পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না, ইহাও নিউটনের অতি পূর্ব্ব হইতে মানবজাতি দেখিয়া আসিতেছে।

এইখানে আকর্ষণের কথা ও অনুরাগের কথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ নীরস পদার্থবিদ্যার কথাব অবতারণা কবিতে হইল, তজ্জন্য পাঠকের নিকট পূর্ব্বেই ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইলাম। অতি প্রাচীনকাল হইতে কতিপয় ব্যক্তি দেখিয়া আসিতেছেন যে, শুধু চাঁদ কেন, অনেকগুলি জ্যোতিষ্ক বিনা উদ্দেশ্যে পৃথিবীর চারিদিকে অবিরাম গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিনা উদ্দেশ্যে ভ্রমণশীল এই জ্যোতিষ্কগুলার সাধারণ নাম গ্রহ। রবি শশী উভয়কে ধরিয়া এইরূপ সাতটি গ্রহের অস্তিত্ব বহুদিন হইতে মনুষ্যের নিকট বিদিত ছিল।

এই গ্রহগুলি নিতান্ত অকারণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াই

তেছে, হয় ত এইরূপ নির্দ্দেশ উচিত হইল না। গ্রহগণের এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। তোমার জন্মকালে বৃহস্পতি যখন কর্কটরাশিস্থ ছিলেন, তখন তুমি পঁয়ত্রিশটি বিবাহ করিতে বাধ্য, ইহা অনেক ভদ্রলোকে অদ্যাপি পুবা সাহসে বলিয়া থাকেন। গ্রহগণেব অবস্থান মনুষ্যের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে; ইহাতে যে সন্দেহ করে, সে নির্ব্বোধ, কেন না, চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার-ভাটা কি প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে? আর ঐরূপ একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে বিধাতা কি এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন, যে এতগুলি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডকে অনর্থক ঘুরিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, গ্রহগুলা যে ঐরূপে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু দেখা যায়, উহাদের পরিভ্রমণেব পথ বড়ই আকাবাঁকা। প্রাচীনেবা অনেক চেষ্টাতেও সেই পথেব জটিলতার অন্ত পান নাই। গ্রহগণের মধ্যে চন্দ্র আর সূর্য্য কতকটা সবল নিয়মে চলিয়া বেড়ান। কিন্তু অন্যান্য গ্রহ কখন কোথায় থাকেন, তাহার গণনা দুষ্কর। উহারা কখন ধীবে চলেন, কখন দ্রুত চলেন, কখন আবার চলিতে চলিতে পিছু হাঁটেন যেখানে ঘুরিয়া না বেড়াইলে নিস্তার নাই, সেখানে আবাব এত লুকোচুরি খেলা কেন?

হঠাৎ কোপর্নিকস বলিলেন, কি তোমাদেব দৃষ্টির ভ্রম! উহাদেব গতিব নিয়মে এত যে জটিলতা দেখিতেছ, সে তোমাদেরই দৃষ্টির দোষে। একবার মনোরথে চাপিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া দাঁড়াও, দেখিবে কেমন সুন্দর সুশৃঙ্খলায় উহারা ধীরভাবে ও সুনিয়তভাবে সূর্য্য-মণ্ডলেরই চারিদিকে ঘুরিতেছে। আর দেখিতে পাইবে, তোমার পৃথিবী, সেও স্থির নহে, সেও অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্য্যেরই চাবিদিকে ভ্রমণশীল। আর চন্দ্র, একা তিনিই পৃথিবীব চারিদিকে ঘুরিতেছেন।

বস্তুতঃ সূর্য্য, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না; পৃথিবীই সূর্য্য প্রদক্ষিণ

করে ; এবং অন্য গ্রহেরাও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না, তাহারাও সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের ভ্রমণপথে বিশেষ কোন জটিলতা নাই, তাহাদের ভ্রমণে বিশেষ কোন অনিয়ম নাই। তাহারা কলুর চোকঢাকা বলদের মত অপার গাম্ভীর্য্যের সহিত চক্রপথে একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে একই মুখে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তুমি যদি সূর্য্যমণ্ডলের অধিবাসী হইতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, উহাদের গতি কেমন সুনিয়ত। যে কেন্দ্রের চারিদিকে উহাদের পথ, তুমি স্বয়ং সে কেন্দ্রে না থাকিয়া দূরে পৃথিবীতে রহিয়াছ ও স্বয়ং পৃথিবীর সহিত ঘুরিতেছ। তাই তোমার বোধ হইতেছে, উহাদের পথ এত আঁকাবাঁকা, উহাদের গতি এমন অনিয়ত।

কোপর্নিকসের কথাটা সকলেই দুই চারি বার মাথা নাড়িয়া অবশেষে মানিয়া লইল। ধার্য্য হইল, সূর্য্যই স্থির আর পৃথিবীই অস্থির। সূর্য্য গ্রহ নহে ; পৃথিবীই গ্রহ। কেন না, এখন হইতে স্থির হইল যে, যাহারা সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তাহারাই গ্রহ।

কোপর্নিকসের পর কেপলার। কেপলার দেখাইলেন, গ্রহগণ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে বটে, এবং উহাদের চলিবার পথ প্রায় বৃত্তাকার বটে, কিন্তু ঠিক বৃত্তাকার নহে। একটা গোলাকার আঙটীকে দুই পাশ হইতে চাপ দিলে যেমন হয়, পথ কতকটা সেইরূপ। এইরূপ পথকে জ্যামিতিবিদ্যায় বৃত্তাভাস বা অপবৃত্ত বলিয়া থাকে। সূর্য্য সেই প্রায় বৃত্তাকার পথের, অর্থাৎ বৃত্তাভাস পথের ঠিক্ মধ্যস্থলে অবস্থিত না থাকিয়া একটু পাশে অবস্থিত আছে। বৃত্তাভাস পথের যাহাকে অধিশ্রয় বলে, যাহা ঠিক্ মধ্যস্থানে না থাকিয়া একটু পাশ ঘেঁষিয়া থাকে, সূর্য্যের অধিষ্ঠান সেইখানে। এই জন্য প্রত্যেক গ্রহ কখন সূর্য্যের একটু কাছে থাকে, বা একটু দূরে যায়। এই আমাদের পৃথিবীই শীতকালে সূর্য্যের একটু নিকটে আসে, আর

গ্রীষ্মকালে একটু দূরে যায়। শীতকালে নিকটে থাকে শুনিয়া পাঠক চমকিয়া উঠিবেন না, তাহাই ঠিক্। আরও একটা কথা; কোন গ্রহ যখন সূর্য্যের একটু কাছে থাকে, তখন একটু দ্রুত চলে, আর যখন একটু দূরে থাকে, তখন ঠিক্ সেই অনুপাতে একটু ধীরে চলে। কেপলার প্রত্যেক গ্রহের সম্বন্ধে কেবল এই কয়টা নূতন কথা বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি আরও একটা নূতন ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্বের সহিত উহাদের ভ্রমণকালের একটা সম্বন্ধ আছে। গ্রহগণ স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু আগে হইতে যেন একটা পরামর্শ আঁটিয়া ঘুরিতেছে। যে যত দূরে আছে, তাহাকে এক পাক ঘুরিয়া আসিতে তত অধিক সময় লাগিতেছে; কত দূরে থাকিলে কত সময় লাগিবে, সে বিষয়েও একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থির হইয়া আছে নিয়মটা এই। মনে কর দুইটা গ্রহ ক আর খ; খ'র দূরত্ব ক'র চারি গুণ। এখন চারিকে ত্রিঘাত করিলে চারি চারি ষোল ও চারি ষোলতে চৌষট্টি হয়। আর চৌষট্টির বর্গ-মূল হয় আট। এখন ক যদি ঘুরে এক বৎসরে, খ'কে ঘুরিতে হইবে আট বৎসরে। তেমনি যদি গ-এর দূরত্ব হয় নয় গুণ, তাহা হইলে নয়কে ত্রিঘাত করিলে ৯×৯×৯=৭২৯, আর ৭২৯ এর বর্গ-মূল ২৭; তাহা হইলে ক যদি ঘুরেন এক বৎসর তাহা হইলে গ, যিনি নয়গুণ দূরে আছেন, তাঁহাকে ঘুরিতে হইবে ২৭ বৎসরে। বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যন্ত ছয়টা গ্রহ এইরূপে যেন পরামর্শ করিয়া যথাবিহিত সময়ে আপন আপন পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে।

কেপলার গ্রহগণের গতির সম্বন্ধে এই কয়টা নিয়ম আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক গ্রহই বৃত্তাভাস পথে চলিতেছে, এবং সূর্য্য হইতে দূরত্বভেদে কখন বা একটু দ্রুত, কখন বা একটু মন্দ গতিতে চলিতেছে। আর

বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন পথে থাকিয়াও আপন আপন দূরত্বের হিসাবে ভ্রমণকালের একটা নিয়ম স্থির করিয়া সেই হিসাবে যথাকালে চলিতেছে। এই পর্য্যন্ত হইল ঘটনা। ইহার সত্যতায় অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই, কেন না সত্য বটে কি না, কিছু দিন ধরিয়া আকাশ পানে চাহিয়া থাকিলেই বুঝিতে পারিবে। আপেল ফল বৃন্তচ্যুত হইলেই মাটিতে পড়ে, ইহা যেমন সত্য ঘটনা, গ্রহগণ উক্ত নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ইহাও সেইরূপ সত্য ঘটনা।

কিন্তু উহারা ঐরূপে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন, এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, ঘুরিয়া বেড়ায় সে ত দেখিতেছি; কিন্তু কেন বেড়ায়?

গ্রহগুলার কি এত মাথাব্যথা, যে সূর্য্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেই হইবে।

আর ঘুরিবেই যদি, ত প্রত্যেকেরই পথটা এমন কেন? আর বেড়াইবার রীতিটাই বা এমন কেন? কাছে থাকিলে একটু দ্রুত যাইতে হইবে, দূরে গেলে একটু ধীরে চলিতে হইবে, ইহার তাৎপর্য্য কি।

আবার এতগুলি গ্রহ বিভিন্ন পথে চলিতেছে, অথচ সকলে মিলিয়া ভ্রমণকালের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া লইয়াছে কেন?

কেপলার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াছিলেন, এমন নহে। উত্তর কতকটা এরূপ;—উহারা ঘুরে, উহাদের মরজি; উহারা বড় লোক ও ভাল লোক, উহারা কি আর অসংযতভবে অনিয়মে ঘুরিতে পারে? অথবা এক একটা গ্রহ এক একটা দেবতার বাহন; দেবতারা কি একটা মতলব আঁটিয়া ঐরূপ খেলা খেলিতেছেন। সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহগণ আপনার পথে বিচরণ করে জানিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহারা কেপলারের উত্তরে হাসিলে অনুচিত হইবে।

কেপলারের পর দেকার্ত্তে। তিনি বলিলেন, সূর্য্যমণ্ডলকে ঘেরিয়া

ও সৌরজগৎ ব্যাপিয়া একটা অবিরাম ঝড় বহিতেছে। গ্রহগুলা সেই ঝড়ের মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। এই ঝড় যতদিন না থামিবে, উহাদিগকে ততদিন এইরূপে ঘুরিতে হইবে।

দেকার্ত্তের পর নিউটন। নিউটন কেপলার-প্রদর্শিত গ্রহগণের গতির নিয়ম আলোচনা করিলেন। দেখিলেন প্রত্যেক গ্রহ নির্দ্দিষ্টকালে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করে। আরও দেখিলেন, যার দূরত্ব যত অধিক, তার ভ্রমণের কালও তত অধিক-দিন-ব্যাপী। দেখিলেন, এই দূরত্ব ও এই ভ্রমণকালের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। নিউটন সেই সমুদয় আলোচনা করিয়া গ্রহগণের গতির নিয়মগুলি একটি সংক্ষিপ্ত সূত্রে ফেলিলেন। সূত্রটার আকার অতি সংক্ষিপ্ত; কেপলারের আবিষ্কৃত সমুদয় নিয়মগুলি সেই সংক্ষিপ্তসূত্রের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। সেই সূত্রটির একটু আলোচনা করা হউক।

সূত্রটি এই। প্রত্যেক গ্রহের প্রতি সূর্য্যের অভিমুখে একটা আকর্ষণবল রহিয়াছে; যে গ্রহের দূরত্ব যত অধিক, এই আকর্ষণবলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প।

এই সূত্রে একটা নূতন শব্দ রহিয়াছে,—আকর্ষণবল। আকর্ষণ শব্দটার বিশেষ মাহাত্ম্য নাই। বল শব্দটার তাৎপর্য্য হৃদ্গত করা একটু কঠিন।

বল কাহাকে বলে? বল একটা পারিভাষিক শব্দ যাহাতে গতি উৎপাদন করে, তাহাই বল। একবার দেখিয়াছিলাম কোন পণ্ডিত গম্ভীরভাবে তর্ক উপস্থিত করিতেছেন ক্রোধে হস্তপদাদির গতি উৎপন্ন হয়, অতএব ক্রোধ একটা বল। নিউটনের প্রেতপুরুষ তাঁহার পরিভাষার এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়াছিলেন কি কাঁদিয়াছিলেন, বলিতে পারি না।

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা আবশ্যক। কিন্তু ভাষার

দোষে ভাব কেমন বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়, নিউটনের দত্ত বলের সংজ্ঞার দুর্গতি দেখিলে কতক বুঝা যাইতে পারে। নিউটনের ভাষায় গতি উৎপাদন বলের কাজ; বল গতি জন্মায়। গতি জন্মায় ইহার অর্থ কি? মনে কর একখানা ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল, চলিতে লাগিল। উহার গতি জন্মিল। ক্রমে উহার বেগ বাড়িতে লাগিল; ষ্টেশন ছাড়িয়া প্রথম মিনিটে চলিয়াছিল আধ পোয়া, তার পর মিনিটে চলিল এক পোয়া, উহার বেগ বাড়িল, এখানেও বলিব উহার গতি জন্মিতেছে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী যখন পূরা দমে ঘণ্টায় যাটি মাইল বেগে চলিতেছে, তখন আর গতি জন্মিতেছে কি? না। বেগ তখন খুব অধিক, কিন্তু বেগ আর বাড়িতেছে না, গতি জন্মিলে বেগ বাড়িত। এখন উহা মিনিটে এক মাইল চলিতেছে, এ মিনিটেও এক মাইল, আবার পর মিনিটেও এক মাইল; বেগ খুব অধিক বটে, কিন্তু সে বেগ আর বাড়িতেছে না, কাজেই এখন গতি আর নূতন করিয়া উৎপন্ন হইতেছে না, নিউটনের ভাষায় বলিতে হইবে, যতক্ষণ বেগ বাড়িতেছিল ততক্ষণ গতি উৎপন্ন হইতেছিল, ততক্ষণ বল ছিল। যখন আর বেগ বাড়ে না, তখন আর গতি জন্মেনা, তখন আর বল থাকে না। বলের কাজ গতি উৎপাদন; বলের কাজ বেগ বাড়ান।

আবার ট্রেণখানা যখন সোজা পথ ছাড়িয়া, সরল রেখা ছাড়িয়া বাঁকা পথে কুটিল রেখায় চলে, তখনও উহাতে নিউটনের ভাষায় গতি জন্মায়। গতি ছিল এক মুখে, অন্য মুখে নূতন গতি জন্মাইয়া গতির মুখ বদলাইয়া দেয়। এ ক্ষেত্রেও নিউটনের ভাষায় বলা হয়, বলের কাজ গতি উৎপাদন, এখানেও গতি জন্মিতেছে, অতএব বল আছে।

যাঁহারা পদার্থবিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন কিন্তু তাহা হজম করেন নাই, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, গতি উৎপাদনের কারণ

বল। গতি উৎপাদন কার্য্য, বল তাহার কারণ। গতি উৎপন্ন হয় কেন? বল আছে বলিয়া। বল না থাকিলে গতি উৎপন্ন হইত না।

কথাটা এক হিসাবে ঠিক্; অন্য হিসাবে ঠিক্ নহে। বল না থাকিলে গতি উৎপাদন হয় না, বলই গতি জন্মায়। ইহা ঠিক্ কথা। কেন না, নিউটন বলিয়াছেন, যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে, সেইখানেই বলিবে যে বল আছে। যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে না, সেইখানেই বলিবে বল নাই। কাজেই ইহা ঠিক্ কথা।

ঠিক্ কথা বটে; কিন্তু তথাপি গতির উৎপাদনেব কারণ বল, এরূপ বলিলে ভুল হয়। গতি উৎপাদনেব কারণ কি জানি না। কারণ যাহাই হউক, বল তাহার কাবণ নহে। কেন বুঝাইতেছি।

ঐ জন্তুটার চাবি পা ও উহা হাম্বা স্বরে ডাকিতেছে। উহার সর্ব্ববাদিসম্মত নাম গরু।

এখন জিজ্ঞাস্য, উহা গরু, এই জন্য উহা হাম্বা ডাকে? না হাম্বা ডাকে বলিয়াই উহা গরু? কোন্ প্রশ্নটা ঠিক? হাম্বাধ্বনির কারণ উহাব গোত্ব, না গোত্বের কারণ হাম্বাধ্বনি?

ফলে উহাকে তুমি গরুই বল আর ভেড়াই বল, নামে কিছুই যায় আসে না, ও হাম্বা ডাক কিছুতেই ছাড়িবে না। উহাকে ঐরাবৎ নাম দিলেও হাম্বা ছাড়িয়া বৃংহিত ধ্বনি করিবে না। উহার হাম্বা ডাকাই স্বভাব উহা হাম্বাই ডাকিবে—অকাতরে ডাকিবে।

তবে যে চতুষ্পদ হাম্বা ডাকে, তাহাকে আমরা ভেড়া না বলিয়া গরু বলি, ঐরাবৎ না বলিয়া সুরভি বলি। যে হাম্বা ডাকে সে গরু; ও হাম্বা ডাকে, অতএব ও গরু; ইহা বলাই ঠিক্। হাম্বা ধ্বনির কারণ গোত্ব নহে; গোত্বের কাবণ হাম্বাধ্বনি।

ঠিক্ এই হিসাবে গতি উৎপাদনের কারণ বল নহে, বলের বিদ্যমানতার কারণ গতির উৎপত্তি। বল আছে, অতএব গতি জন্মিতেছে,

বলা সঙ্গত নহে। গতি জন্মিতেছে দেখিলেই বলিব যে বল আছে, ইহাই সঙ্গত। গতি উৎপাদনের নামান্তর বলের প্রয়োগ।

বৃন্তচ্যুত আপেল ফল পৃথিবীর মুখে গতি উৎপন্ন হয়। কেন হয়? পণ্ডিত অপণ্ডিত সমস্বরে বলেন যে পৃথিবী বল প্রয়োগ করে; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল আছে, এই জন্য উহা গতি পায়। আমরা বলি, উত্তরটা ঠিক্ হইল না। উহার ভূপতনের, ভূমিমুখে উহার গতি উৎপত্তির, কারণ মাধ্যাকর্ষণ নহে। উহা কেন পড়ে, কি কারণে পড়ে, তাহা জানি না। গরুর যেমন হাম্বা ধ্বনিই স্বভাব, তাহার তেমনই ভূপতনই স্বভাব। পতনকালে বেগ বাড়ে, তাহাই দেখিয়া আমরা বলি উহা মাধ্যাকর্ষণ বলে ভূপতিত হইতেছে, উহা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

গ্রহ সূর্য্যকে ঘুরে কেন? সূর্য্য-অভিমুখে বল রহিয়াছে, এই জন্য কি? না, তাহা নহে। বল রহিয়াছে, এই জন্য ঘুরে না, ঘুরে তাই দেখিয়া আমরা বলি বল রহিয়াছে। একটা কথাই দুই রকম ভাষাতে ব্যক্ত করি।

হরিচরণ ভাত খাইতেছেন, অথবা অন্নের পিণ্ড ভোজন করিতেছেন। ভোজনের কারণ কি খাওয়া? অথবা খাওয়ার কারণ কি ভোজন? এ প্রশ্ন উপহাস্য। সেইরূপ পৃথিবী সূর্য্যকে ঘুরিতেছে; সূর্য্যমুখে পৃথিবীর প্রতি বল আছে বা আকর্ষণ আছে। ঘুরিবার কারণ বল, অথবা বলের কারণ ঘুরিয়া বেড়ান? এ প্রশ্নও ঠিক সেইরূপ। একটা ঘটনা দুই রকম ভাষায় বর্ণিত হইতেছে, একটা ভাষা সরল ভাষা, সাধারণ লোকের বোধগম্য প্রচলিত ভাষা, আর একটা ভাষা পণ্ডিতের ভাষা সঙ্কেতের ভাষা সংক্ষিপ্ত ভাষা, এই পর্য্যন্ত প্রভেদ।

পৃথিবী ঘুরে কেন? তাহার উত্তর হইল না। কেন ঘুরে, জানি

না, দেখিতেছি যে ঘুরিতেছে; ঘুরিতেছে দেখিয়া বলিতেছি, যে বল আছে; সূর্য্যের মুখে গতি জন্মিতেছে ও সূর্য্যের মুখে আকর্ষণ বল আছে। ঘুরিতেছে কেন বল রহিয়াছে কেন, জানি না।

কেপলার দেখিয়াছিলেন, বুধ শুক্র পৃথিবী প্রভৃতি সকলেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। নিয়মটা কেপলার সহজ ভাষায় সাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায়, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। নিউটন সেই কেপলারেরই নিয়ম অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাষায়, সাঙ্কেতিক ভাষায়, পণ্ডিতের বোধ্য ভাষায়, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

নিয়মটা কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের একটা বাঁধা সম্বন্ধ আছে। যে সকল গ্রহ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, সকলেরই ভ্রমণপক্ষে সেই নিয়ম। কেপলার সেই নিয়ম দেখিয়াছিলেন। নিউটনও তাহাই ভিন্ন ভাষায় সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নিউটন আর একটু অধিক দেখিয়াছিলেন। কেপলার তাহা দেখেন নাই। গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। গ্রহগণে সূর্য্যের মুখে গতি জন্মিতেছে; আবার চন্দ্রেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মিতেছে। আবাব আপেল ফল ভূপতিত হয়; বৃন্তচ্যুত হইলেই উহার বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উহা ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়, সুতরাং আপেল ফলেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মে। নিউটন কেপলার অপেক্ষা অনেকটা অধিক দেখিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন, গ্রহগণ যে বাঁধা নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঠিক্ সেই নিয়মেই চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, আর ঠিক্ সেই নিয়মে আপেল ফলও পৃথিবীর দিকে ধায় বা যায় বা চলে, বা আকৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই এক নিয়ম। নিয়মটা দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের সম্বন্ধ লইয়া; এই সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই এক। কেপলার গ্রহগণের গতিবিধিতে যে নিয়ম, যে সম্বন্ধ দেখিতে পান, নিউটন চন্দ্রের গতিতে ও আপেল ফলের

গতিতেও সেই নিয়ম, সেই সম্বন্ধ, দেখিতে পান। এইটা নিউটনের বাহাদুরি।

নিউটন দেখিলেন, এতগুলা জড়দ্রব্যের গতিতে, গ্রহগণের সূর্য্য-মুখ গতিতে, চন্দ্রের ও আপেল ফলের পৃথিবীমুখ গতিতে, একই নিয়ম, দেশ কালগত একই সম্বন্ধ, বর্ত্তমান। নিউটন অনুমান করিলেন, সাহস করিয়া বলিলেন, তবে জড়জগতের সর্ব্বত্র জড়দ্রব্যমাত্রেরই গতিতে এই নিয়ম বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। নিউটনের অনুমানের, নিউটনের সাহসিকতার, সমূলকতা পদে পদে পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত, অন্ততঃ সৌর জগতের ভিতরে, কোন জড়পিণ্ডকে এই নিয়ম অতিক্রম করিতে দেখা যায় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইল, দেখা যাক। গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট, উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্ট, সৌর জগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী পদার্থমাত্রই গতিবিশিষ্ট। প্রাচীনকালে, কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, এই সকল গতি অসংযত অনিয়ত বোধ হইত। কেপলারের পর ও নিউটনেব পর হইতে আমরা দেখিতেছি, এই সমুদয় গতির মধ্যে একটা সুন্দর নিয়ম বিদ্যমান আছে নিয়মটা কিরূপ, তাহা নিউটন সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই অমুক দ্রব্য আজি অমুক স্থানে রহিয়াছে বলিয়া দিলে, কাল বা দুই শত বৎসর পরে তাহা কখন্ কোন্ স্থানে থাকিবে, অব্যর্থ সন্ধানে গণিয়া বলিয়া দিতে পারি।

কিন্তু এই সম্বন্ধ কেন? এই নিয়মের অস্তিত্বের কারণ কি? গ্রহগণ, উপগ্রহগণ ও আপেল ফল সকলেই একই নিয়মে চলাফেরা করিতেছে কেন। এ প্রশ্নের কোন উত্তর মিলিল না। পৃথিবী আপেল ফলকে আকর্ষণ করে, তাই আপেল ফল গতিবিশিষ্ট হয়। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবী সূর্য্যমুখে গতিবিশিষ্ট হয়,—বলিলে চোখে ধূলা দেওয়া হয়; এই ধরণের উত্তর বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ;

ইহা প্রতারণা। অজ্ঞানকে জ্ঞানের সাজ দিলে যদি প্রতারণা হয়, ইহা সেইরূপ প্রতারণা। আপেল ফল পৃথিবীর দিকে চলে, ইহা সকলেই জানে। সালঙ্কার ভাষায় বলিতে পার, কবিত্বার ভাষায় বলিতে পার, পৃথিবী আপেল ফলকে আকর্ষণ করে বা আপেল ফলকে টানে। আকর্ষণের স্থলে অনুরাগ শব্দ বসাইলে বা প্রেম শব্দ বসাইলে ভাষা আরও কবিত্বময় হইতে পারে, আরও সরস হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধি কিছুই হয় না। আপেল ফল পড়ে, এই শাদা কথার যে অর্থ পৃথিবী আপেলকে আকর্ষণ করে, এই সরস কথারও বুদ্ধিমানের নিকট সেই অর্থ। আপেল ফল কেন পড়ে, তাহা জানি না। জানিবার উপায় আছে কি? পৃথিবী আপেল ফলকে কোন অদৃশ্য রজ্জুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে কি? হইতে পারে; কিন্তু জানি না।

নিউটন সৌর জগতের অন্তর্ভূত দ্রব্যমাত্রেরই গতিতে একটা বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। নিউটন সাঙ্কেতিক ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাষায় উহার বর্ণনা দিয়াছেন। একটা সংক্ষিপ্ত সূত্রের ভিতর অনেকগুলা কথা পূরিয়াছেন; একটা বিস্তৃত ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বিবরণ মাত্র; বিবরণের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। ব্যাকরণ কৌমুদীর দশটা সূত্র মুগ্ধবোধের একটা সূত্রের সমান ফল দেয়। উভয়ই বিভিন্ন ভাষায় একই ব্যাপারের বর্ণনা দেয়। চলিত ভাষায় যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে দশ পাতা কাগজ লাগে, এই দীর্ঘ প্রবন্ধে পাঠককে নির্য্যাতন করিয়াও যে বিবরণ সম্যক্‌ভাবে দিতে পারি নাই, নিউটনের ক্ষুদ্র সূত্রে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়ম সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ। ইহাতে নির্ব্বোধের চোখে ধাঁধা লাগে, বুদ্ধিমানের পক্ষে মানসিক শ্রমের সংক্ষেপ সাধন ঘটে। নির্ব্বোধে বলে, নিউটন আপেল ফল পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; বুদ্ধিমানে জানেন, নিউটন দেখাইয়াছেন, আপেল ফল জগতে যে নিয়মে চলে, গ্রহ

উপগ্রহ হইতে ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড পর্য্যন্ত সেই নিয়মেই চলে। কেন চলে, নিউটন জানিতেন না, আমরাও জানি না। নিয়ম আছে, ভাল। নিয়ম না থাকিত, হয়ত আরও ভাল হইত। অন্ততঃ এই দুর্ব্বহ মানবদেহধারণের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত।

নিয়মের রাজত্ব

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বৃহৎ কেতাবই লিখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যের আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদ্গদকণ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাকল বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময় এই নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাকল মানিতে চাহেন না তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্ব্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয়পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধের পরিবর্ত্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে

একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্য্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক!

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে কেহই ঊর্দ্ধমুখে আকাশ পথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন, যে কোন দ্রব্য ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম-আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে লোকটা মিথ্যাবাদী, কেহ বলিবে লোকটা পাগল; কেহ বলিবে লোকটা গুলি খায়, এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ননামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতর জলের পরিবর্ত্তে হাইড্রোজন গ্যাস ছিল। কেন না, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে নারিকেল,—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজন নাই, এ হেন নারিকেল—কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে তবে হাইড্রোজনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আর ভূমিতে পড়ে কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাশুটবিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়মভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজন পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হটিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিবদ্রব্যমাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না, ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেইত প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল।

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ।

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে বলিবার পূর্ব্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষাযোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম :—

ধারা—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্য মধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয় তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয় তাহা হইলে ঊর্দ্ধগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কতদূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয় ; ইহা প্রাকৃতিক নহে। সুতরাং উহার ব্যভিচার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই ; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্য প্রদেশে, বাষ্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে জলমধ্যে তেলের মধ্যে পারদমধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে তখন লঘু গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম ; ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয় উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবি, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে ; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি !

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া ; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া ;—নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না ; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কি না, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থমাত্রেই তেমনই মগ্নদ্রব্যমাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণ নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে

উভয় বর্ত্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল; সেখানে, মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'।

এখন এ পক্ষ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবেন, দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তুমাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তুমাত্রই উর্দ্ধগামী হয়।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়,

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে উর্দ্ধগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন না, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। দুই শত বৎসরের অধিক হইল, একজন লোক পৃথিবীকে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ কেবল নারিকেল ফলেই ও আতাফলেই আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ বহুদূরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না। এই ব্যক্তির নাম সার আইজাক নিউটন।

তিনি জানাইলেন, দূরস্থ চন্দ্রদেব পর্য্যন্ত পৃথিবীমুখে নামিতেছেন, ক্রমাগত ভূমিস্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শ লাভটি ঘটিতেছে না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর তাঁহার পার্ষদবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথিবীমুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ সকলেই সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন। স্বস্থানে স্থির থাকিতে কাহারও চেষ্টা নাই; সকলেই সকলের দিকে ধাবমান।

ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বিধানে; পৃথিবী সূর্য্য হইতে এতদূরে আছেন; আচ্ছা, পৃথিবী এইটুকু জোরে সূর্য্যের অভিমুখে চলিতে থাকুন চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন; বেশ, চন্দ্র প্রতি মিনিটে এত ফুট করিয়া পৃথিবী মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্দ্র হইতে এতদূরে আছেন; তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাঁহার কলেবর কিছু গুরু ভার তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে চলিলেই হইবে; চন্দ্র পৃথিবীর তুলনায় লঘুশরীর; তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে না। তুমি বৃহস্পতি, বিশালকায় লইয়া বহুদূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সূর্য্যদেব বর্ত্তমান; তুমি তাঁহার অভিমুখে এই নির্দ্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য, আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকে একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক দিয়াও একটু ঘুরিয়া চলিতে হইবে। আর শনৈশ্চর কোটি-কোটি লোষ্ট্রখণ্ডের মালা পরিয়া গর্ব্ব করিও না, এই ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। নেপচুন, তুমি বহুদূরে থাকিয়া এতকাল লুকাইয়াছিলে; উরেনস্‌কে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।

আবিষ্কৃত হইল বিশ্ব জগতে একটা মহানিয়ম;—একটা কঠোর আইন; এই আইন ভঙ্গ করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। সূর্য্য

হইতে বালুকণা পর্য্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, নির্দ্দিষ্ট বিধানে নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছে। খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিতে পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে প্রচলিত আছে, ইহার এলাকা কত দূর বিস্তৃত? সমস্ত বিশ্বসাম্রাজ্যের কি এই নিয়ম চলিতেছে? বলা কঠিন। সৌর জগতের মধ্যে ত আইন প্রচলিত দেখিতেই পাইতেছি। সৌর জগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর পাওয়া দুষ্কর! খগোলমধ্যে স্থানে স্থানে এক এক যোড়া তারা দেখা যায়; তারকাযুগলের মধ্যে একে অন্তকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। যেমন চন্দ্র ও পৃথিবী এক যোড়া বা পৃথিবী সূর্য্য আর এক জোড়া, কতকটা তেমনি। পরস্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝা যায়, সৌর জগতের বাহিরেও এই আইন বলবৎ। কিন্তু সর্ব্বত্র বলবৎ কি না বলা যায় না। কেন না সংবাদের অভাব। দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এত দূর আছে, যে পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্ত যে তাহা আমাদের গণনাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষগোচরও হয় না।

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। সমস্ত খগোলমধ্যে সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি কোন দিন আবিষ্কৃত হয় যে কোন একটা তারা বা কোন একটা প্রদেশের তারকাগণ এই আইন মানিতেছে না তাহা হইলে কি হইবে? যদি বিশ্বসাম্রাজ্যের কোন প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না?

মনে কর, নিউটন সৌর জগতের মধ্যে যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা গেল বিশ্বজগতের অন্ত কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, সেখানে গতিবিধি অন্ত নিয়মে ঘটে; তখন কি বলিব? তখন নিউ-

টনের নিয়মকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিব, বিশ্বজগতের এই প্রদেশে এই নিয়ম ; অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়ম। এই প্রদেশে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ঐ প্রদেশে ঐ নিয়মের ব্যভিচার নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই নিয়মের বন্ধন,—জগৎ নিয়মের রাজ্য। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম সর্ব্বত্র চলে না বটে, কিন্তু কোন না কোন নিয়ম চলে।

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলাম, যতদিন তাহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখিলাম না, বলিলাম এই নিয়ম অনিবার্য্য, ইহার ব্যভিচার নাই। যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি সংশোধনের ব্যবস্থা! তখনই ভাষা বদলাইয়া নিয়ম সংশোধিত ভাবে প্রকাশ কবিলাম। বলিলাম, অহো, এতদিন আমার ভুল হইয়াছিল, ঐ স্থানে ঐ নিয়ম, আর এই স্থানে এই নিয়ম। আগে যাহা নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা নিয়ম নহে, এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম ;—যেন ব্যাকরণের সূত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দেব রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ এই দুইটি বাদ দিয়া। এখানে সাবেক নিয়মের যে ব,ভিচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহা প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা একটা নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব নিয়ম ;—এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যভিচারই নিয়ম। ইহার উপর আর কথা নাই।

অর্থাৎ কি না নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ না কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিবার উপায় নাই। জলে শোলা ভাসিতেছে, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও না, এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্ত্তমান আছে, তবে জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্থানে ইহাই নিয়ম। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা ভাল হইল না ; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এ বৎসর

হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার অতিবৃষ্টি ঘটিয়াছে; এবার ত এ দেশে বর্ষা না হইবারই কথা; ঠিক ত নিয়মমত কাজই হইয়াছে। নিয়ম দেখা গেল, চুম্বকের কাঁটা উত্তরমুখে থাকে। পরেই দেখা গেল, ঠিক উত্তর মুখে থাকে না; একটু হেলিয়া থাকে। আচ্ছা উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় যতটা হেলিয়া আছে, লণ্ডন সহরে ততটা হেলিয়া নাই; না থাকিবারই কথা; উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় এ বৎসর যতটা হেলিয়া আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ, উহাই ত নিয়ম? চুম্বকের কাঁটা চিরকালই একমুখে থাকিবে, এমন কি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়; দুই শত বৎসর ধরিয়া বরাবরই দেখিতেছি, ঐরূপ সরিয়া যাইতেছে উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ত নিয়ম। প্রতি এগার বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার সূর্য্যবিম্বে যখন কলঙ্কসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মরুপ্রদেশে উদীচী উষার দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখনও এই নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়ে। বাড়িবেই ত ইহাই ত নিয়ম।

একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সরল রেখাক্রমে ঋজু পথে যায়। যতক্ষণ একই পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবরই একই মুখে চলে। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিলে সম্মুখের দেওয়ালে আলো পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাহিলে সম্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ-পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হইবে আলোক ঋজু পথে চলে। নতুবা ছায়া পড়িত না, চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ ঘটিত না। অতএব আলোকের সোজা পথে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে দেখা যায়, আলোক ঠিক্ সোজা পথে না গিয়া আশে পাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত যায়। শব্দ

যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সমুখেই চলে ও আশে পাশে চলে, সেইরূপ আলোকরশ্মি সূক্ষ্মছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমুখে চলে ও আশ পাশে চলে। এখন বলিতে হইবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; এরূপ ক্ষেত্রে আশে পাশে যাওয়াই নিয়ম। বস্তুতঃ এস্থলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় এই। যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, কিন্তু যে কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্দ্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারে কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পূরা সাহসে বলাই দায়।

অথবা যাহা দেখিব তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়ম লঙ্ঘনের সম্ভাবনা কোথায় চিরকাল সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি; উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া আছি, কেহ পশ্চিমে সূর্য্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি ছুনিয়ার লোক দেখিতে পায়, সূর্য্যদেব পশ্চিমেই উঠিলেন আব পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন তখন সেদিন হইতে উহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প, কিন্তু যদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক এক যোট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি?

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মটা কিরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম, বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, ঠিক্ নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা; কোন নিয়ম বা খুব জটিল। কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোন-

টাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি ঐখানে ঐ ব্যভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলা সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অসম্বন্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্ম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে। বহুকাল হইতে মানুষে দেখিয়া আসিতেছে, সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে, কাষ্ঠরূপী ইন্ধনযোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোক ও তাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্কে নানা তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্পদিন মাত্র জানিয়াছে। যত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে; যতক্ষণ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষসীমায় না আইসে, ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন্ নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে মিলাইয়া তাহাদের সাহচর্য্যগত ও পরম্পরাগত সম্পর্ক যাহা নিরূপণ করিতেছি, তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু ঘটে তাহা যতই অজ্ঞাতপূর্ব্ব হউক না কেন, তাহা যতই অভিনব হউক না, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন স্থলে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে সেই ব্যতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের রাজ্য। ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি?

ইহাতে আনন্দ গদগদ হইবারই বা হেতু কি? আর নিয়মের শাসনে জগদ্‌যন্ত্র চলিতেছে মনে করিয়া একজন সৃষ্টিছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার কোথায়? জগতে কিছু না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাই বরং আশ্চর্য্য—একটা কিছু যে ঘটিতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। জগৎ ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি না; ভক্ত বলেন, ইহা কোন্ অঘটন-ঘটনা পটুর লীলা; বৈদান্তিক বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ; বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।

—•:•:•—